পলাশী থেকে প্যালেস্টাইন

জ্ঞানগঞ্জ
উপনিবেশ-বিরোধী কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা

পলাশী থেকে প্যালেস্টাইন *সম্পা অত্রি ভট্টাচার্য*
Polashi theke PyalesTaine Ed Atri Bhattacharya
প্রচ্ছদের ছবি - ঢাকার Artists Against Genocide To GAZA, From DHAKA থিমের মোট ৩২টা দেয়াল গ্রাফিতির একটা

১৭৭০/১১৭৬ গণহত্যা গবেষণা আন্দোলন ।। জনভাণ্ডার ।। অপ্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা উদ্যম।। বই প্রকাশ পরিকল্পনা।। গ্রন্থাগার প্রকল্পের অধীনে জ্ঞানগঞ্জ।। উপনিবেশ-বিরোধী কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা, ৪ হিদারাম ব্যানার্জী লেন, কলকাতা - ৯ পক্ষে প্রকাশনা করলেন বিশ্বেন্দু নন্দ, বহ্নিহোত্রী হাজরা, অত্রি ভট্টাচার্য

সম্পাদকমণ্ডলী বিশ্বেন্দু নন্দ, বহ্নিহোত্রী হাজরা, অত্রি ভট্টাচার্য, অর্ক ভাদুড়ি, মহুয়া লাহিড়ী, অর্ণব সাহা, জ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবতোষ সরকার, সৌরভ গুহ, সুরজিৎ সেন, রক্তিম ঘোষ, মিলটন বিশ্বাস, সৈয়দ নকিব মাহমুদ, শাজাহান আলি, ছৈয়দ মোহাম্মদ মিনহাজুর রহমান, আল মারুফ রাসেল, জয়ন্ত ভট্টাচার্য

ছাপা, বাঁধাই বাদল ঘোষ, এরিস্টোপ্রিন্ট, ৪ হিদারাম ব্যানার্জী লেন, কলকাতা - ৯

দাম ৮০ টাকা
প্রথম প্রকাশ ১৭ কার্তিক ১৪৩০, ৪ নভেম্বর ২০২৩
কপিরাইট নেই

‘এত হত্যা, এত আগুন মধ্যযুগ দেখেছে কখনও?’

আমি পাশের ঘর থেকে তোমাকে, তোমার মাকে জিজ্ঞেস করতে শুনেছি, ‘মা, আমি কি ফিলিস্তিনি?’ তোমার মা যখন ‘হ্যাঁ’ বলল, তখন পুরো বাড়িতে একটা ভারী নীরবতা নেমে এল। যেন আমাদের মাথার উপর ঝুলে থাকা কিছু ঝরে গেছে, তার শব্দ বিস্ফোরিত হচ্ছে, তারপর - নীরবতা।’

লিখেছিলেন ঘাসান কানফানি। প্যালেস্তিনীয় ও কবি, দুইই হওয়ার অপরাধে ইজরায়েলী জায়নবাদ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের যৌথ-জোটের হাতে তাকে কোতল হতে হয়।

আমরা, যারা বাংলার মানুষ তারা আপাদমস্তক আমাদের সর্বস্ব লুঠ হতে দেখেছি। দেখেছি বহিরাগত ব্রিটিশ হানাদার আমাদের তুলনা করেছে অতিপ্রজননশীল খরগোশের সঙ্গে। আর সেইসব মানুষেরা, যারা ছিলেন এদের দেশীয় কোলাবরেটর, তারা ইউরোপীয় লুঠেরাদের দ্বারা পরিকল্পিত গণহত্যাকে একবার নয়- দুইবার মন্বন্তর বলে চালিয়ে এসেছে। আজ আবার ফিলিস্তিনের ভাগ্যাকাশে তেমনই এক দুর্যোগের ঘনঘটা। যে ইউরোপীয় লুঠ-গণহত্যার ঐতিহ্যের জন্মলগ্ন বাংলায় পলাশীর প্রান্তর, সম্ভবত তার শেষতম প্রয়োগশালা প্যালেস্টাইনের গাজায় আরেক ঔপনিবেশিক শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মদতে বোমাবর্ষণের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক কর্তৃত্বপরায়ণতার এক বৃত্তকে সম্পূর্ণ করছে। যে ইউরোপীয় লুঠ-গণহত্যার ঐতিহ্যের জন্মলগ্ন বাংলায় পলাশীর প্রান্তর, সম্ভবত তার শেষতম প্রয়োগশালা প্যালেস্টাইনের গাজায় আরেক ঔপনিবেশিক শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মদতে বোমাবর্ষণ।

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-স্পনসরড ইসলামোফোবিক প্রোপাগান্ডার ‘দেশজ’ বিকাশ। বাংলার গ্রামসমাজের খরচে ধনী হয়ে ওঠা স্থানীয় প্রভাবশালী নব্য জমিদার-শ্রেণীর ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের তেল মারতে তৈরী হওয়া কলকাতার ‘দুগ্গিপুজো’ এবছর পরিণত হয়েছে একটি মুসলিম-বিদ্বেষী কার্নিভালে। ভদ্রবিত্ত বাঙালি এখন সিনেমাহলে কোকাকোলা-পপকর্ণ চিবুতে চিবুতে ‘জিহাদী’ মুসলমান রমণীর মাথায় ভারতরাষ্ট্রের রক্ষাকারী এক ‘দুর্গাবাহিনী’র প্রতিচ্ছবির দ্বারা গুলি করতে দেখতে চায়। স্লো-মোতে দেখতে চায়, মাচো

স্বাধীনতা সংগ্রামীর রুদ্রাক্ষপ্রেম। রামমন্দিরের ডুপ্লিকেট মন্ডপসজ্জার ড্রোনশটে ছেয়ে যায় বাঙালির ইনস্টাগ্রাম।

বিশ্বজোড়া বিদ্বেষের বিষবাষ্প আজ ঘরে বাইরে। এতদিন উপনিবেশ বিরোধী চর্চা/ কর্পোরেট বিরোধী চর্চাদলের পক্ষ থেকে যে কথাগুলি অবিরত বলে যাওয়া হচ্ছে তা ক্রমশ মূর্ত হয়ে উঠছে। এই বিশ্বজোড়া পুঁজিতন্ত্রের 'রিসেট' রাজনীতিকে বুঝতে উপনিবেশ বিরোধী চর্চা/ কর্পোরেট বিরোধী চর্চা একটি আলোচনাসভার আয়োজন করেছিল। গত ১৭ই কার্তিক, ৪ নভেম্বর, বিকেল ৫.৩০টার সময়ে বৌবাজারে হকার সংগ্রাম কমিটির দপ্তরে। বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইমানুল হক, বহ্নিহোত্রী হাজরা, বিশ্বেন্দু নন্দ প্রমুখেরা। উপস্থিত ছিলেন পুবের কলম পত্রিকার সম্পাদক এবং রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান আহমেদ হাসান ইমরান।

কোভিড পরবর্তী পৃথিবীতে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে আন্তর্জাতিক পটপরিবর্তন হচ্ছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলির ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একচ্ছত্র মৌরসিপাট্টা সম্পর্কে সর্বত্র বিভিন্ন ধরণের প্রশ্নচিহ্ন, আলাপ খাড়া হচ্ছে। বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ের একমেরু-বিশ্বের তত্ত্বকে খারিজ করে নয়া-শক্তিধর হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে চিন-রাশিয়া জোট। ভারতের মাটিতে ঘটে যাওয়া জি-২০ বৈঠকে চিন, রাশিয়ার উল্লেখযোগ্য অনুপস্থিতি, ভারতের বিদেশনীতির দ্যোদুলমানতা সম্পর্কে এদের এক অবিশ্বাসের ভঙ্গি যে রয়েছে, তার দিকেই ইঙ্গিত দিচ্ছে।

ভূরাজনীতির এই টালমাটাল সময়ে, আমরা দেখছি ভারতের নরেন্দ্র মোদী সরকার প্যালেস্তাইন সমস্যা সম্পর্কে ভারতরাষ্ট্রের পুরোনো বোঝাপড়া থেকে সরে এসে, দেশের ভিতরে নির্বাচন-পূর্ব সময়ে ইসলামোফোবিয়ার চাষ করতে চাইছে।

একদা প্রয়াত ফিলিস্তিনি গণবুদ্ধিজীবী এডওয়ার্ড সঈদ ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাতে নৈতিক স্বচ্ছতা এনেছিলেন, যুক্তি দিয়েছিলেন যে একবার ফিলিস্তিনিদের প্রতি অবিচার স্বীকৃত এবং একেবারে শেষ হয়ে গেলেই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সম্ভব হবে। তার 'কোয়েশ্চেন অফ প্যালেস্টাইন' গ্রন্থে তিনি অভিযোগ করেছিলেন- সাধারণভাবে আরব বিশ্বের এবং বিশেষ করে ফিলিস্তিনিদের নিয়ে আলোচনা পশ্চিমা দুনিয়ায় বিভ্রান্ত আলাপ এবং অন্যায় তির্যকভঙ্গিতে করা হয়। 'একদিন আপনি জেগে উঠবেন এবং জিজ্ঞাসা করবেন 'আমি কী করছি?' সঈদ বলেছিলেন, ইসরায়েলি জনসাধারণকে উদ্দেশ্য করে। এই পুস্তিকায় থাকল তার প্রতি তৈরী হওয়া মিথ-মোহমায়াজাল ভেদকারী একটি লেখাও।

অবশেষে প্রার্থনা এই,
ফিলিস্তিন মুক্ত হোক।
উপনিবেশ নিপাত যাক।

ধন্যবাদান্তে
অত্রি ভট্টাচার্য
১৭ অগ্রহায়ন ১৪৩০
বেহালা, পর্ণশ্রী
কলকাতা - ৭০০০৬০

এডওয়ার্ড সাঈদ কি ইজরাইলি সৈন্যদের দিকে ঢিল ছুঁড়ছিলেন?

সারোয়ার তুষার

ওপরের ছবিটাতে ভুবনবিখ্যাত তাত্ত্বিক ও লড়াকু বুদ্ধিজীবী এডওয়ার্ড সাঈদ ঢিল ছুঁড়ছেন। পাশে তাঁর ছেলে। কিন্তু বিভিন্ন উপলক্ষে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া হোমফিডে সাঈদের ঢিল ছোঁড়ার ছবিখানা ভাসতে দেখা যায়, এবং নানা কিসিমের মন্তব্য দেখা যায়। বলা বাহুল্য, পক্ষে-বিপক্ষের নানা মতামত মূল ঘটনা সম্পর্কে বেখবর থেকে করা মন্তব্য। একপক্ষ বলতে চায়, দ্যাখো এই হলো বুদ্ধিজীবীর 'আসল' দায়িত্ব! মানে সম্মুখ সমরে বা রাজপথে গিয়া পুলিশ বা সেনাবাহিনীকে ইট-পাটকেল মারার 'বিপ্লবী' সাহস না থাকলে কিসের বুদ্ধিজীবী! মোটাদাগে এরকম একটা টোন থাকে এ ধরনের বক্তব্যে।

বিশেষত 'বুদ্ধিজীবীর দায়/করণীয়' সংক্রান্ত আলোচনায় সাঈদের এই ইট-পাথর মারার ছবি হাজির হয় এবং যে-সকল বুদ্ধিজীবী অ্যাক্টিভিজম না করে কেবল চিন্তা বা লেখালেখি বা কথা বলার প্রতিই আগ্রহী তাদের 'পলায়নপর' ও 'ভীরু' হিসেবে হাজির করার চেষ্টা থাকে এসব বক্তব্যে। কারণ তাদের মধ্যে ইট-পাটকেল মারার সাহস দেখা যায় না! ফলে বলতে চাওয়া হয় যে, এহেন বুদ্ধিজীবীরা 'মেরুদণ্ডহীন'; তারা সাঈদের মতো 'সাহসী' নন!

এখন, বুদ্ধিজীবীরা রাজপথে থাকবেন কি থাকবেন না তথা অ্যাক্টিভিজম করবেন কি না সেইটা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রশ্ন। এখানে আমি এ বিষয়ে আলাপ করতে চাই না। কিন্তু উল্লিখিত মন্তব্যকারীরা সাঈদের ছবিটাকে ভুলভাবে বা আজগুবি ব্যাখ্যাসহ হাজির করে থাকেন। বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা সম্পর্কে তাদের উইশফুল থিংকিং-এর চাপের কারণে তারা কখনো মূল ঘটনার খোঁজ নেয়ার চেষ্টা করেন নাই।

আসলে এই ছবিতে ইসরাইলি সৈন্যদের দিকে সাঈদ কোনো ঢিল ছোঁড়েন নাই; বরং লেবাননের ভূমি ইসরাইলি সৈন্যরা ত্যাগ করার পর তথা দখলমুক্ত হওয়ার পর সাঈদ সেখানে গিয়ে ঢিল ছুঁড়েছিলেন এটা নির্দেশ করতে-যে লেবাননের ভূমি ইসরাইলি সৈন্যমুক্ত হলো, এখন চাইলেই ঢিল ছোঁড়া যায়। এটা ছিল দখলদারত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার একটা প্রতীকী উদযাপন।

কিন্তু ছবিটা আমাদের এখানে একজন বুদ্ধিজীবী সম্মুখে সমরে মিলিটারিদের সাথে লড়ছেন এই অর্থে ব্যাখ্যা করা হয়। এই ব্যাখ্যা মিসলিডিং। সাঈদ আজীবন ইজরায়েল বিরোধী অবস্থান জারি রেখেছিলেন। এমনকি তিনি ইয়াসির আরাফাতের প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশনেও জড়িত ছিলেন। পরে মতভিন্নতার কারণে ওই সংগঠন ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সাঈদ ওই মুহূর্তে যা করছিলেন না, তা সাঈদের নামে প্রচার করার মধ্যে কোনো মাহাত্ম্য নাই।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই ছবিখানা নিয়ে বিভ্রান্তির ইতিহাস অবশ্য হালের নয়। সাঈদ যে-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতেন, অর্থাৎ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীও এই ছবিটাকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে সাঈদ 'ভায়োলেন্ট অ্যাক্ট'-এ জড়িয়েছেন, সুতরাং তাকে শাস্তি দেয়া হোক, এমনকি সাঈদকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিস্কার করা হোক - এমন দাবিও তুলেছিলেন। সে সময় শিক্ষার্থীদের পত্রপত্রিকায় এ নিয়ে ধুন্ধুমার বিতর্ক চলছিল (Bilgrami 2014)

এর ফলে বেচারা সাঈদকে ভালোই নাজেহাল হইতে হইসিল আর পেরেশানি পোহাইতে হইসিল। যেমন এ ছবি নজরে আসার পর ভিয়েনার ফ্রয়েড সোসাইটি সাঈদের একটা পূর্বনির্ধারিত লেকচার বাতিল করে। এডওয়ার্ড আলেক্সান্ডার নামের এক সাংবাদিক এক ম্যাগাজিনে সাঈদকে 'প্রফেসর অব টেরর' বলে সাব্যস্ত করেন। এসবের জবাবে সাঈদ লেখেন, "It was a pebble; there was nobody there. The guardhouse was at least half a mile away."

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটা যেভাবে সুরাহা করসিল তা-ও বেশ কৌতুকপ্রদ। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় 'প্রভোস্ট' পত্রিকায় লিখলেন-যে, সাঈদের এই কর্মকাণ্ড (ঢিল ছোঁড়া) বাকস্বাধীনতা ও প্রকাশের স্বাধীনতার নীতির আওতায় বিবেচনা করতে হবে। ব্যস, ওমনি সাঈদ-বিরোধী প্রফেসর-স্টুডেন্ট কোরাম সমস্ত গোলমাল থামাইয়া দিয়া বিরাট শান্ত হইয়া যায়। বাক ও প্রকাশের স্বাধীনতার এক প্রায় ধর্মতাত্ত্বিক অনুশাসন পুরো ঘটনায় লক্ষ করা যায়।

সাঈদের কলিগ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক এবং তাত্ত্বিক আকীল বিলগ্রামির বইয়ে এ ঘটনার দীর্ঘ বিবরণ পাওয়া যায়। বিলগ্রামিকে উদ্ধৃত করছি - A couple of years ago it was reported in the newspaper that my colleague Edward Said threw a stone on a recently liberated site in Lebanon in the direction of abuilding housing some Israeli guards. He was with his son, and he did so in order to let off steam and express some satisfaction at the liberation of an area, which the occupying Israeli forces had evacuated. Some professors and students at Columbia University demanded that action be taken against Said for a violent act, suggesting that he even be asked to leave the university. There was a lot of discussion and much controversy was exchanged in the student newspaper. Now even if one thinks as I do that the demand was pre-posterous and farcical (though I am sure it did not seem particularly farcical to poor Said who was harassed-as he so often was-by the most disagreeably malicious and false propaganda about it), it was interesting to see what a lot of calm and clarity was brought, even among those making the preposterous demand, when the provost wrote in the newspaper to say that Said's throwing the stone is to be subsumed under the principle of free speech and expression.

Secularism, Multiculturalism and the very Concept of law, Akeel Bilgrami, SECULARISM, IDENTITY AND ENCHANTMENT; Harvard University Press, 2014)

ফিলিস্তিনি কবিতা

প্রতিকূল সময়ে একটি কান্না মোছার গান
ফাহাদ আবু খাদরা

ওহ, সময়ের উদ্যানের সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ তুমি স্নিগ্ধ স্বপ্নের মধ্যে অতিবাহিত করেছ,
ছায়ায় সমৃদ্ধ তোমার ধনুক তুমি রেখে গেছ হাহাকারে।

আর আমাদের গভীরে সমাহিত তোমার গৌরবময় রহস্য কি কখনো ফিরে আসবে?

আজ যখন আমরা ভন্ডামি আর অন্ধ অজ্ঞতায় আচ্ছন্ন, আজ যখন বাসনা আমাদের খাদের গভীরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, যখন দিগন্তে আমরা মৃত্যু আর তিক্ত পরাজয় ছাড়া আর কিছুই দেখি না, তখন আমরা কীভাবে আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকাব?

আমরা কীভাবে প্রতিটি প্রজন্মকে প্রতিশ্রুতি দিতে পারি যে আমরা আবার সেই পুরানো স্বাধীন মানুষের পাশে দাঁড়াব?

কিভাবে আমরা আমাদের মর্যাদার ঋতু পুনরুদ্ধার করতে পারি?

আমরা কিভাবে পারব? আমরা কিভাবে পারব?

শত্রুর বিচরণ আর হাহাকার আমাদের জীর্ণ করে দিয়েছে আমাদের দীর্ঘ প্রতীক্ষা
আমাদেরকে জীর্ণ করেছে অপমান আমাদের ক্লান্ত করেছে হায়, কালের উদ্যানে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ আমরা আবার কবে হব?
কখন?

আমাদের হৃদয়ে সান্ত্বনার জন্য কোন জায়গা নেই।

ত্বহা মহম্মদ আলি

স্বপ্ন

আগে একটা স্বপ্ন দেখতাম তুমি চলে যাচ্ছ বলে দুঃখে দম বন্ধ হয়ে যেতো, কিন্তু সেটা স্বপ্ন ছিল।

এবং আমি হঠাৎ জেগে উঠতাম আর ভীষণ আনন্দ হত।

আর দুপুরটা ভরে যেতো সোনালী গমে।

তুমি ছিলে আমার দুঃখ আর তুমি ছিলে আমার আনন্দ।
কিন্তু এখন..
আমি স্বপ্ন দেখি তুমি আসছ।
আমি ভীষণ আনন্দিত।
কিন্তু ঘুম থেকে উঠে দেখি এটা একটা স্বপ্ন।
দুঃখে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে... আর তোমার পথ চেয়ে থাকা এই সন্ধেতে ঝুপ করে নামে, অন্ধকার।

তিনি যিনি ঈশ্বরের সাথে কথা বলেন
রাশদী আল মাদি

জাহাজের ধনুকে জলে জল... উঠে আসেন জোসেফ
একটি স্বপ্ন পড়ে থাকে কুয়োতে,
এ গ্রহের কক্ষপথ তাকে রক্ষা করে।

তোমার লড়াই চালিয়ে যাও, নূহ, যখন 'এশতার কাফেলার দৈর্ঘ্য রক্ষা করছিলেন'
আমার পিতা তখন ঈশ্বর মুসাকে আপ্রাণ ডাকছিলেন।

ফসল, গম এবং পাথরের স্বপ্ন, হে ফেরাউন আপনি নিয়ে যান।

তৌফিক জায়েদ
ক্রুশবিদ্ধ

হে প্রিয়জনেরা আমার
আমি, মিছরি এবং ফুলের সাথে এখনও সমস্ত ভালবাসার অপেক্ষায়।

আমি, পৃথিবী, চাঁদ, বসন্ত, জলপাইগাছ, ফুলের কুঁড়ি আমাদের তৃষ্ণার্ত বাগান, আমাদের লাঙ্গল, একটিমাত্র অবশিষ্ট আঙ্গুর বাগান এবং হাজার হাজার সবুজ কবিতা যা থেকে পাথর একটি পাতা হয়।

এদের সকলের সাথে আমি, মিছরি এবং ফুলের সাথে আমার সমস্ত ভালবাসা অপেক্ষা করে আছে।

পূর্ব দিক থেকে আসা প্রচণ্ড বাতাস দেখি, সম্ভবত তার ডানার ডানায় আমাদের কাছে খবর

আসবে।

হয়তো একদিন নদী চিৎকার করবে:
'শ্বাস নিন!
অমনোযোগী লোকেরা!
ক্রুশবিদ্ধ প্রভু আমাদের,
জল পার করে গেছেন!'

শব্দগুলো

প্রতিদিনের রুটি বাঁচিয়ে রাখো
বাঁচিয়ে রাখো সঙ্গিনীর হৃদয় এবং শিশুদের খাদ্য - কারণ আমার কাছে কিছুই নেই।

এবং কবিতাকে বাঁচাও।

আগুন জ্বালাও
নির্ণয় কর আসন্ন সময়
আমি কিছুই আয়ত্ত করতে পারি নি

আমার দেশের মাটি
আমার দেশের আকাশ আমার দেশের ফুল ফল
আমি এগুলোর জন্য কখনো দোয়া করিনি।

এই শ্রমনিবিড় জাতি এবং সাধারণ মানুষকে তুমি বাঁচাও।

বাঁচাও তাদের হাতগুলো যদিও আমিও পবিত্র নই।

যদি আমি একজন সেয়ানা হিসাবে বেঁচে থাকতাম, তবে হয়তো আমি একজন সুখী মানুষ হিসাবে মারা যেতাম।

যদি আমার কথাগুলি কিছু লোককে অত্যন্ত আনন্দ দিতে তে সক্ষম হয়, যদি ভবিষ্যতে একটি শিশু এসবই একটি বইতে পড়তে পারে।

তবেই..

৫৭টি মুসলিম দেশের শীর্ষ সম্মেলনে প্রসব হল 'অশ্বডিম্ব'

আহমদ হাসান ইমরান

১

৫৭টি আরব এবং মুসলিম দেশের শীর্ষনেতারা বহুদিন বাদ মিলিত হয়েছিলেন রিয়াধে। প্রেক্ষাপট ছিল, অবরুদ্ধ গাজায় যেভাবে ইসরাইল বাড়িঘর, হাসপাতাল, মসজিদ, চার্চ এবং জীবন ধারণের সমস্ত উপকরণ ধূলিসাৎ করে যাচ্ছে, সেই সম্পর্কে আলোচনা। ১৯৪৮ সালের পর উচ্ছেদকৃত যেসব ফিলিস্তিনি গাজায় বসবাস করছেন, তাঁদের উপর নৃশংস আক্রমণের কথা এখন সারা পৃথিবী জানে। মনে হয়, পশ্চিমা শাসকরা এইসব টিভির পর্দায় সকাল থেকে রাত পর্যন্ত দেখে খুবই আমোদ পাচ্ছেন। আশা ছিল, এতগুলি মুসলিম দেশের শীর্ষনেতাদের বৈঠকে এমন কোনও সিদ্ধান্ত হবে যাতে গাজার ২৩ লক্ষ মানুষ খানিকটা হলেও স্বস্তি পাবে। আর ইসরাইল পাবে স্পষ্ট হুঁশিয়ারি যে, ফিলিস্তিনের বেসামরিক মানুষের উপর বিমান, ক্ষেপণাস্ত্র ও মারাত্মক বোমাবর্ষণ করে যে অবাধ হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ তারা চালাচ্ছে, তা অবিলম্বে বন্ধ হবে। না হলে ইসরাইলকে ফল ভোগ করতে হবে।

কিন্তু তাবড় তাবড় মুসলিম নেতাদের এই বৈঠক ঘাতক ইসরাইলকে আরও মজবুতি দিয়েছে। রিয়াধে মুসলিম নেতারা অসহায়ভাবে যেসব আলোচনা করেছেন, যে ঘোষণাপত্র জারি করেছেন তাতে ইসরাইলের সেনাপ্রধান, রাজনীতিবিদ এবং ইসরাইলের নীতি-নির্ধারকরা মনে হয় বেজায় খুশি হয়েছেন। কারণ, মুসলিম বিশ্বের এই তাবড় তাবড় নেতারা বিবৃতি দেওয়া ছাড়া কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছেন।

অনেকে বলছেন, এর থেকে সউদির রাজধানী রিয়াধে এই 'ইসলামি সম্মেলন' না করলেই বরং ভালো হত। মুসলিম বিশ্বের প্রখ্যাত নেতারা এতে উপস্থিত ছিলেন। অনেক মাথা ঘামানোর পর সম্মেলন থেকে বিদায় নেওয়ার সময় এরা সকলেই 'অশ্বডিম্ব' পয়দা করেছেন। প্রস্তাব এসেছিল অনেকগুলি। যেমন, ইসরাইলে তেল সরবরাহকে বানচাল করতে হবে। আসলে কিন্তু এই উদ্দেশে কোনও পদক্ষেপের ঘোষণা মুসলিম দেশগুলি করতে পারেনি। ইরান প্রস্তাব রেখেছিল, ইসরাইলি সেনাবাহিনী ও ইসরাইলকে সন্ত্রাসী সংগঠন ও সন্ত্রাসী রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করা হোক। কিন্তু না, ইসরাইল 'ছোট হবে' এই ধরনের কোনও প্রস্তাব তাঁরা গ্রহণ করতে পারেননি। পাকিস্তান শর্ত ছাড়াই অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধের ডাক দিয়েছিল। না, ৫৭টি দেশ একযোগে এই প্রস্তাবটিতেও সহমত পোষণ করেনি। ফলে ঘোষণাপত্রে এগুলি রাখা হয়নি। তবে কিছু গরম গরম ভাষণ অবশ্যই হয়েছে।

সারা দুনিয়া বিশেষ করে মুসলিম বিশ্ব আশা করেছিল, আহা, তাদের নেতা, রাজা-বাদশাহ, স্বৈরাচারী সামরিক শাসকরা যখন বৈঠকে মিলিত হয়েছেন তখন হয়তো গাজায় শিশু, নারীদের লাগাতার হত্যাযজ্ঞ বন্ধ হবে। ফিলিস্তিন সমস্যার

সমাধানের বার্তা যাবে। গাজা ও ওয়েস্ট ব্যাঙ্কের ফিলিস্তিনি নারী-পুরুষরা আশার আলো দেখবেন ইত্যাদি আরও কত কী। কিন্তু আদতে এই সম্মেলনে এসে দেখতে পাওয়া গেছে, আরব রাষ্ট্রগুলির কেউই ইসরাইলকে চটাতে রাজি নয়। রাজি নয় ফোঁস করতেও। তারা কেউই ইসরাইলকে কোনও হুঁশিয়ারি দিতে পারেনি। পারেনি গাজা ও ওয়েস্ট ব্যাঙ্কের ৫০ লক্ষ নারী-পুরুষ, শিশুর জন্য কোনও ভরসার বাণী দিতে। তবে তুর্কি প্রেসিডেন্ট এরদোগান ও ইরানের প্রেসিডেন্ট রাইসি এবং কাতারের আমীর কিন্তু রাজা-মহারাজাদের থেকে আলাদা বক্তব্য রেখেছেন। আর এটাও জানা দরকার, কারা ইসরাইল সামান্য বিপদে পড়তে পারে, সামান্য সংযত হতে পারে এই ধরনের প্রস্তাবকে গ্রহণ করতে রাজি হননি। তাঁরাও মুখে না বললেও বুঝিয়ে দিয়েছেন, মুসলিম নারী, পুরুষ, শিশুদের ঘাতক নেতানিয়াহুর প্রতি তাঁদের সমর্থন।

কোন মুসলিম দেশগুলি যায়নবাদী, খুনি ইসরাইলের বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাসে বাধা দিয়েছিল? এ কথা এখন সকলেই জানতে চাইছে। ইসলামপন্থী এই দেশগুলির নেতৃত্ব দিয়েছে সউদি আরব। মুহাম্মদ বিন সলমন এখন ইসরাইলের 'পরম মিত্র'। ইসরাইল সম্ভবত তাঁকে বুঝিয়েছে, যদি শাহী গদি রাখতে চাও তবে ইসরাইলি সেনা ও মোসাদ-এর সহায়তা তোমাদের বিশেষ প্রয়োজন। মোসাদ সবসময় আরবের এই রাজা-বাদশাহদের ভয় দেখায়, আমরা না থাকলে তোমরা ইসলামপন্থীদের বিদ্রোহে ক্ষমতা হারাবে।

সউদি আরব ছাড়া আর যে দেশগুলি ইসরাইলের সুরক্ষায় খাড়া হয়েছিল, তাদের মধ্যে রয়েছে সংযুক্ত আমীরশাহী এবং বাহরাইন। এই দেশগুলি আল-আক্সা দখলকারী ইসরাইলের সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত করতে ইতিমধ্যেই তেল আবিবের সঙ্গে চুক্তি করে বসে আছে। সউদি আরবের পর ইসরাইল প্রেমিক হিসেবে উঠে এসেছে সংযুক্ত আমীরশাহী (ইউএই), মরক্কো, বাহরাইন, সুদান, মৌরিতানিয়া, জীবুতি, জর্ডন এবং এল সিসির কবজাধীন রাষ্ট্র মিশর। আরব বিশ্বের সাধারণ মানুষ বলছেন, সত্যিকারের অর্থেই এই সম্মেলন কোনও কিছু হাসিল করতে পারেনি। না পেরেছে যুদ্ধ, হত্যা, ধ্বংসলীলা বন্ধ করতে আর না পেরেছে অবরুদ্ধ গাজা ও পশ্চিম তীরের অধিবাসীদের জন্য কোনও মানবিক সাহায্যের ব্যবস্থা করতে। আসলে আরব রাষ্ট্রগুলি এখন আমেরিকা ও ইসরাইলের দয়াতেই বেঁচে আছে। অর্থাৎ কি না তাদের শাসকরা ইসরাইলের নীল নকশার কাছে আত্মসমর্পণ করে বসে রয়েছে। এই সম্মেলন তারা করেছিল কারণ, কোনও প্রচেষ্টা না করলে দেশের সাধারণ নাগরিক ও ক্ষুব্ধ আলেমদের রোষের মুখে তাদের গদি রক্ষা মুশকিল হবে।

সকলেই জানেন, ইসরাইল বেঁচে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অর্থ, রাজনৈতিক সমর্থন এবং অস্ত্র জোগানের দ্বারা। আর আরব রাষ্ট্রগুলির শাসকরা ক্ষমতায় আছে মার্কিন এবং ইসরাইলের গোপন সমর্থনের জোরে।

তাই ফিলিস্তিনকে যদি স্বাধীনতা ও আজাদির ঝান্ডা নিয়ে বলতে হয়, 'ফ্রি প্যালেস্টাইন', 'আল কুদস মুক্ত করো', আজাদ কর 'মসজিদুল আক্সা', ফিরিয়ে দাও

আমাদের জমিন আমাদেরকেই, তাহলে তা তাদের করতে হবে নিজের ঈমানী চেতনা ও সংগ্রামের দ্বারা। আরব শাসকরা হামাস বা অন্য কোনও গণতান্ত্রিক উত্থানকে ভয় করে। তারা ইসরাইল ও আমেরিকাকে নিজেদের রক্ষাকর্তা ও 'মিত্র' হিসেবে গ্রহণ করেছে। এখন মুসলিম জনগণকেই তাদের ফিলিস্তিনি ভাইদের সমর্থনে এগিয়ে আসতে হবে। শাসকরা ভয়-ভীতি নিয়ে দূর থেকে তা দেখবে।

২

কথিত হলোকাস্ট বেশি ভয়াবহ, নাকি গাজায় ইসরাইলি নরসংহার?

ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরাইলের সেনা ও বিমান বাহিনীর নৃশংস আক্রমণ জারি রয়েছে। সঙ্গে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অর্থ ও ভয়ংকর সব সমরাস্ত্রের জোগান। বিভিন্ন সূত্র এও বলছে, আমেরিকার বিশেষ প্রশিক্ষিত কমান্ডো বাহিনী ইসরাইলে চলে এসেছে এবং তারা ইসরাইলের পক্ষে যুদ্ধে অংশ নিচ্ছে। অস্ত্র পাঠাচ্ছে জার্মানি, ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি পশ্চিমা দেশও।

তবে একটা কথা পরিস্কার, ইসরাইল যুদ্ধের এক মাস পাঁচ দিন পরও হামাসকে পরাজিত করতে পারেনি। গাজায় সবকিছু ধ্বংস করে দেওয়ার পরও যায়নবাদীদের ট্যাঙ্ক বাহিনী এখনও স্থলযুদ্ধে গাজার দখল নিতে পারেনি। এই যুদ্ধে একটা কথা পরিস্কার, ইসরাইল অপরাজি শক্তি, তার রয়েছে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা, রয়েছে আয়রন ডোম। এইসব কথা যে ফানুস মাত্র, তা প্রমাণিত হয়ে গেছে। মুখোমুখি যুদ্ধে ইসরাইল যে ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে পেরে উঠবে না, তা এখন পরিস্কার। এমনিতেই হিজবুল্লাহর ভয়ে ইসরাইলি সেনা ও নাগরিকরা আতঙ্কে থাকে। ২০০৬ সালের যুদ্ধে রাষ্ট্রহীন সংগঠন হিজবুল্লাহ ইসরাইলকে ভালোই সবক শিখিয়ে দিয়েছিল।

খোদ রাষ্ট্রসংঘ বলেছে, ইসরাইল ছোট্ট জনপদ গাজাকে জাহান্নামে পরিণত করেছে। বলেছে, পৃথিবীতে জাহান্নাম দেখতে হলে গাজাই হচ্ছে তার জলজ্যান্ত নজির।

গাজার শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের ক্রন্দনরত, শোকগ্রস্ত। ক্রুশদ্ধ মুখগুলি বলে দিচ্ছে, আগামীতে যারা বেঁচে থাকবে তারা অবশ্যই কোনও না কোনওভাবে ইসরাইল ও আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবে। আমেরিকা ও পশ্চিমাদের গণতন্ত্র, মানবাধিকার, সবার প্রতি স্বাধীনতা, বিনা বিচারে হত্যায় নিষেধাজ্ঞা, সাধারণ বেসামরিক মানুষের বিরুদ্ধে বোমা বর্ষণ বা হত্যাযজ্ঞ চলবে না- এইসব শ্লোগান যে তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থে তা গাজার ঘটনাবলী স্পষ্টভাবে সামনে এনেছে। মুখোশ একেবারেই পৃথিবীর সচেতন মানুষের কাছে খুলে গেছে।

এখন একটি গুরুতর প্রশ্ন সামনে এসেছে। ইহুদি হত্যাযজ্ঞের কথিত অভিযোগের জন্য দায়ী নাৎসীবাদী হিটলার কি বেশি নৃশংস ছিল? নাৎসীবাদীদের বক্তব্য হচ্ছে, তাদের গ্যাস চেম্বারে ঢুকিয়ে হিটলার নাকি ৬০ লক্ষ ইহুদিকে হত্যা

করেছিল। কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পগুলি অন্তত পক্ষে বন্দি ইহুদিদের জন্য পানি ও খাবারের বন্দোবস্ত খানিকটা হলেও চালু ছিল। যায়নবাদীরা বলে, ইহুদিদের হত্যা করা হয়েছে গ্যাস চেম্বারে পাঠিয়ে। সেখানে গ্যাস দ্বারা নাকি ইহুদিদের হত্যা করা হয়। হয়তো এই ধরনের হলোকাস্ট হতেও পারে। যদিও এ নিয়ে এখন নতুন নতুন গবেষণা চলছে। বেশকিছু কন্সপিরেসি থিওরি ইহুদিদেরই তৈরি গুগলে সার্চ করলে পাওয়া যায়।

যে প্রশ্নটির কথা বলা হচ্ছিল, সেটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমরা মনে করি প্রতিটি মৃত্যুই দুঃখের। তা সে ইহুদিরই হোক কিংবা মুসলিম বা খ্রিস্টানের। অকারণে এবং নিরাপরাধদের জীবন নেওয়ার অধিকার কারও নেই। কিন্তু প্রশ্নটি হল, কোনটা বেশি নৃশংস? কোনটা বেশি মানবিকতা বিরোধী? ইহুদিদের উপর কথিত হলোকাস্ট, নাকি ফিলিস্তিনের গাজায় সাধারণ মানুষকে লক্ষ্য করে ইসরাইলিদের লাগাতার হামলা, নরসংহার এবং ধ্বংসযজ্ঞ? গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে বাসিন্দা-সহ মানুষের ঘরবাড়ি। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে পানি, খাবারের সরবরাহ, ত্রাণ এবং বিদ্যুৎ। বুঝতেই পারা যায়, রাষ্ট্রসংঘের এক প্রতিনিধি কেন গাজাকে বলেছেন 'জীবন্ত জাহান্নাম'। ইতিমধ্যেই শুধুমাত্র গাজায় ইসরাইলি নরসংহারে মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় ১২,০০০ ছুঁতে চলেছে। এদের বেশির ভাগই শিশু ও নারী। আহতের সংখ্যা ২৫-২৬ হাজার। অনেকে এখনও ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে রয়েছেন।

গাজায় যেভাবে বোমা ও ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে মানুষ মারা হচ্ছে, ফসফরাস বোমা ব্যবহার করা হচ্ছে, যা নাপাম বোমায় মৃত্যু থেকেও কষ্টদায়ক, আহত হয়েও লোকেরা বেঁচে থাকতে চায় না, তাঁরা বলেন, আমরা মরে গেলে এই ভয়নক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাব। গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে ফুলের মতো শিশুর মাথা, বেরিয়ে যাচ্ছে নাড়িভুড়ি। গ্যাস চেম্বারে মরার সময় ইহুদিদের কতটা কষ্ট হয়েছে তা হয়তো বিশেষজ্ঞরা বলবেন। কিন্তু এখানে সারা পৃথিবী টেলিভিশনে দেখতে পাচ্ছে, গাজার নারী-পুরুষের কষ্টদায়ক মৃত্যু ও বাঁচার জন্য ছোটাছুটি। নেতানিয়াহু এবং জো বাইডেন উভয়ের সামনে রয়েছে নির্বাচন। তাঁরা নির্বাচনকে সামনে রেখে নরসংহারে মেতেছেন। এটা বলছেন পাশ্চাত্যের পর্যবেক্ষকরাই। প্রশ্নটি থেকেই যাচ্ছে, যে হলোকাস্ট নিয়ে ইহুদিরা এত বেশি প্রচার করে মানুষের সমবেদনা অর্জনের চেষ্টা করে, তা বেশি ভয়াবহ না গাজায় ধ্বংস ও মৃত্যু-স্রোত বেশি নৃশংস। বোঝা যাচ্ছে, দুনিয়াতে মানবাধিকার, গণতান্ত্রিক অধিকার, বেঁচে থাকার অধিকার, জীবন ও সম্পত্তির অধিকারের আর কোনও দাম নেই। আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমারা এগুলির পক্ষে কথা বললে এবার থেকে বিশ্বের মানুষ বলবে, কত্তা একটু আসতে কন। ঘোড়ায় শুনলেও হাসব।

ইজরায়েল - প্যালেস্টাইন

অনিল বিশ্বাস

ইজরায়েলের তেল আভিভে স্তালিনপন্থী কমিউনিস্ট পার্টির মহড়া, ১৯৪৮

জোসেফ স্ট্যালিন আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে অসংখ্য অপরাধ করেছিলেন। কিন্তু তার সবচেয়ে বড় অপরাধের মধ্যে একটি ছিল ইসরায়েল রাষ্ট্রের ভিত্তিকে সমর্থন করা। বিপরীতে, ট্রটস্কিপন্থীরা সর্বদা ইহুদিবাদের বিরোধিতা করেছে। গাজায় ইসরায়েলের হত্যাকাণ্ডের প্রতিক্রিয়ায়, বিশ্বজুড়ে ব্যাপক বিক্ষোভ এবং ফিলিস্তিন জুড়ে সাধারণ ধর্মঘট হয়েছে। সংহতি আন্দোলন সমাজতন্ত্রীদের অন্তর্ভুক্ত যারা জোসেফ স্ট্যালিনকে একটি মডেল হিসাবে দেখেন। আধুনিক স্তালিনবাদীরা সম্ভবত নিজেদেরকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এবং জায়নবাদের বিরোধী হিসেবে দেখবে। তারা নিকোলাই বুখারিন এবং ভিআই লেনিনের প্রভাবে লেখা জাতীয় প্রশ্নে স্ট্যালিনের ১৯১৩ সালের প্যামফলেটে একটি পাদটীকা উদ্ধৃত করতে পারে। লেনিন, যেখানে ভবিষ্যৎ স্বৈরশাসক ইহুদিবাদকে 'ইহুদি বুর্জোয়াদের একটি প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তাবাদী প্রবণতা হিসাবে বর্ণনা করেছেন, যার অনুসারী বুদ্ধিজীবী এবং ইহুদি শ্রমিকদের আরও কিছু পশ্চাৎপদ অংশ ছিল। জায়নবাদীরা প্রলেতারিয়েতের সাধারণ সংগ্রাম থেকে ইহুদি শ্রমিক শ্রেণীর জনসাধারণকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করেছিল।'

কিন্তু স্ট্যালিনের অধীনে সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৪৮ সালে ইসরায়েল রাষ্ট্রের ভিত্তির প্রতি কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানায়? এবং মস্কোর প্রতি অনুগত কমিউনিস্ট দলগুলির উপর তা কি প্রভাব ফেলেছিল?

সোভিয়েত ইউনিয়ন স্বাধীনতা ঘোষণার মাত্র তিন দিন পর ১৭ইমে, ১৯৪৮সালে ইসরায়েলকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেয়। এটি ছিল ইসরায়েলের পক্ষে বিশ্বের প্রথম রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতিরও অনেক আগে।

নিম্নলিখিত লেখাটি প্রখর স্তালিনিস্ট প্রয়াত সিপিআইএম নেতা অনিল বিশ্বাসের 'আজকের বিশ্ব'(সেপ্টেম্বর ১৯৯৮, এনবিএ সংস্করণ) থেকে গৃহীত হয়েছে। উৎসাহী পাঠক, বাঙালি মধ্যবিত্তের বামপন্থার প্যালেস্টাইনের বিষয়ে বর্তমান অনীহার কারণ অনুসন্ধান করতে হলে এ লেখাকে পুনঃপাঠ করতে পারেন।

১৯৯৩ সালের এক স্মরণীয় দিন হল ১৩ই সেপ্টেম্বর। সেদিন হোয়াইট হাউসের লনে স্বাক্ষরিত হয় পি এল ও ইজরায়েল চুক্তি। এই চুক্তির মধ্য দিয়ে প্যালেস্তাইন পেল স্বায়ত্তশাসনের অধিকার। এই অধিকারের জন্য পি এল ও বা প্যালেস্তাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন দীর্ঘ ৪৫ বছর ধরে রক্তাক্ত সংঘর্ষ চালিয়ে এসেছে। বার বার আরব-ইজরায়েল যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। দীর্ঘ ৪৫ বছরের সংগ্রামে প্যালেস্তাইনের তিন লক্ষ নরনারীর জীবনহানি ঘটেছে।

হোয়াইট হাউসের লনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টনের উপস্থিতিতে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় সেই চুক্তিতে অবশ্যই সীমিত স্বায়ত্ত শাসনের কথা বলা হয়। চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন ইজরায়েলের তৎকালীন বিদেশমন্ত্রী সিমন পেরেজ এবং পি এল ও'র বিদেশ বিভাগের প্রধান মাহমুদ আব্বাস। এই চুক্তির সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন মার্কিন বিদেশ সচিব ওয়াবেন ক্রিস্টোফার এবং রুশ বিদেশমন্ত্রী আন্দ্রেই কোসিরেভ। চুক্তি শেষে ইয়াসেব আবাফত ঘোষণা করেন : "আজকের এই চুক্তি হলো সার্বভৌম প্যালেস্তাইন রাষ্ট্র গঠনের প্রথম পদক্ষেপ।" আমেরিকার হোয়াইট হাউসে যখন এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হচ্ছে ঠিক তখনই প্যালেস্তাইনের ইজরায়েলী অধিকৃত ভূখণ্ড গাজা ও ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক ছিল উৎসবমুখর। হাজার হাজার প্যালেস্তিনীয় নরনারী বিজয় পতাকা নিয়ে সেদিন রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন। নাচ আর গানে সমগ্র এলাকা মুখরিত হয়ে ওঠে। নিষিদ্ধ প্যালেস্তিনীয় পতাকা উড়তে থাকে ঘরে ঘরে।

হোয়াইট হাউসের চুক্তির পূর্বে ১০ই সেপ্টেম্বর পি এল ও এবং ইজরায়েলকে পারস্পরিক স্বীকৃতি দিয়ে আর একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। জেরুজালেমে চুক্তিপত্রে সই করেন ইজরায়েলের তৎকালিন প্রধানমন্ত্রী ইঝাক রাবিন। একই সময়ে নরওয়ের রাজধানী তিউনিসে অপর এক চুক্তিপত্রে সই করেন পি এল ও প্রধান ইয়াসের আরাফত। ইজরায়েল স্বাক্ষরিত চুক্তিতে বলা হয় : প্যালেস্তিনীয় জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে পি এল ও'কে ইজরায়েলী সরকার স্বীকৃতি দিচ্ছে এবং পশ্চিম এশিয়ার শান্তি স্থাপন প্রক্রিয়ায় ইজরায়েল প্যালেস্তাইনের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাবে। চুক্তি বলে ইজরায়েল অধিকৃত ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক ও গাজা স্ট্রিপের জেরিকো অঞ্চলে প্যালেস্তিনীয়রা স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। ১৯৪৮ সালে প্যালেস্তাইনে ইহুদি রাষ্ট্র ইজরায়েল প্রতিষ্ঠিত হবার পর এই চুক্তি ছিল প্রথম চুক্তি।

হোয়াইট হাউসে সম্পাদিত এই চুক্তি নানাদিক থেকে ঐতিহাসিক হলেও কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। এই চুক্তির আশু প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনার পূর্বে প্যালেস্তাইন-ইজরায়েল বিরোধটা একটু খতিয়ে দেখা দরকার। আজ মধ্যপ্রাচ্যে অন্যতম শক্তিধর

রাষ্ট্র হিসেবে যে ইজরায়েল অবস্থান করছে তা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে প্রতিষ্ঠিত। এটি একটি ইহুদি রাষ্ট্র। ১৯৭৬ সালে যদিও সংবিধান সংশোধন করে ইজরায়েলকে ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে চিত্রিত করা হয়, ১৯৯১ সালে নতুন করে সংবিধান সংশোধনের মধ্য দিয়ে এই রাষ্ট্রের পূর্বে ইহুদি রাষ্ট্র শব্দটি জুড়ে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৮ সালের ১৪ই মে ইজরায়েল রাষ্ট্র হিসেবে রাষ্ট্রসঙ্ঘের স্বীকৃতি পায়। কিন্তু এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপটটা কি? ১৯০৭ সালে বিশ্ব ইহুদি সংগঠন প্যালেস্তিনীয় অঞ্চলে পৃথক ইহুদি রাষ্ট্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। দশ বছর পর অর্থাৎ ১৯১৭ সালে ব্রিটেন প্যালেস্তাইন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ইহুদিদের জন্য স্বশাসিত অঞ্চল স্থাপনের পরিকল্পনা অনুমোদন করে। এদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পর পরই পূর্ব ইউরোপ থেকে হাজার হাজার ইহুদি বিতাড়িত হয়ে ঐ অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ব্যাপক ইহুদি অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে ১৯২০, ১৯২৯, ১৯৩৩ এবং ১৯৩৬ সালে ঐ অঞ্চলে বারবার আরবদের জাতীয়তাবাদী অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। তখন প্যালেস্তাইন ব্রিটিশ শাসিত রাষ্ট্র। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে লাখে লাখে ইহুদি ঐ অঞ্চলে চলে যেতে বাধ্য হন। আরব এবং ইহুদিদের মধ্যে প্রতিদিন রক্তাক্ত সংঘর্ষ চলতে থাকে। ব্রিটিশ শাসিত প্যালেস্তাইনেই ৫০ হাজার বেশি আরব নরনারী নিহত হন। তখন ব্রিটিশ সরকার সমস্ত বিষয়টি রাষ্ট্রসঙ্ঘের হাতে তুলে দেয়। ১৯৪৭ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘ প্যালেস্তাইনকে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়। ৩০ শতাংশ ইহুদি সংখ্যালঘু জনগণের জন্য ৬০ শতাংশ প্যালেস্তাইন ভূখণ্ড ছেড়ে দেওয়া হয়। আরবরা এর প্রতিবাদ করে। প্রথম থেকেই ইহুদিরা সন্ত্রাসবাদের আশ্রয় নেয়। গ্রামকে গ্রাম পুড়িয়ে দিতে থাকে এবং ১৯৪৮ সালের ১৪ই মে ইজরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। প্যালেস্তিনীয়রা এর প্রতিবাদ করেন। অধিকাংশ আরব রাষ্ট্রই প্যালেস্তিনীয়দের পাশে এসে দাঁড়ায়। যুদ্ধ বাঁধে। এই যুদ্ধ ছিল আরব-ইজরায়েলের মধ্যেকার পাঁচটি যুদ্ধের মধ্যে প্রথম যুদ্ধ। যুদ্ধে আরবরা পরাজিত হন। প্যালেস্তাইনের ৮০ শতাংশ ভূখণ্ড ইজরায়েলের দখলে চলে যায়। বাকি ২০ শতাংশের মধ্যে ওয়েস্ট ব্যাঙ্কের দখল নেয় জর্ডন এবং গাজা স্ট্রিপের দখল নেয় মিশর । বারো লক্ষ প্যালেস্তিনীয় পরিপূর্ণভাবে রাষ্ট্রহীন উদ্বাস্তুতে পরিণত হন। পার্শ্ববর্তী আরব রাষ্ট্রসমূহের ১৪টি দেশে তাবু খাটিয়ে এই বারো লক্ষ (বর্তমানে বিশ লক্ষ) নরনারী যাযাবরের জীবনযাপন করছেন।

১৯৬৭ সালে ইজরায়েল পার্শ্ববর্তী সকল আরব রাষ্ট্রের উপরই আক্রমণ শুরু করে। ছয়দিনের এই যুদ্ধে ইজরায়েল জর্ডনের কাছ থেকে ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক এবং মিশরের কাছ থেকে গাজা স্ট্রিপ ছিনিয়ে নেয়। কেবল তাই নয়, প্যালেস্তিনীয় অধ্যুষিত মিশরের সিনাই এবং সিরিয়ার গোলান হাইটসও তারা দখল করে। আরো ৪ লক্ষ প্যালেস্তিনীয় দ্বিতীয়বারের জন্য উদ্বাস্তু হলেন। আর প্যালেস্তিনীয়দের নিজ ভূখণ্ড বলে আর কিছু রইল না। মিশর ও জর্ডানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সেদিন ব্রিটেন ও ফ্রান্স ইজরায়েলের পক্ষ অবলম্বন করেছিল।

১৯৬৭ সালের পর আবার আরব-ইজরায়েল যুদ্ধ বাঁধে ১৯৭৩ সালে। এই

যুদ্ধে আরবদের কিছুটা অগ্রগতি ঘটে। সিরিয়া গোলান হাইটস পুনরুদ্ধার করে। কিন্তু ইজরায়েলী বাহিনী গোলান হাইটসের কুইনেত্রা শহর ত্যাগ করার পূর্বে সমগ্র শহরটি পুড়িয়ে দেয়। ৫৫ হাজার নরনারী উদ্বাস্তু হয়ে পড়েন। ১৯৭৯ সালে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির মধ্য দিয়ে মিশর সিনাই ফিরে পায়।

ইজরায়েল তার জন্মলগ্ন থেকেই আরবদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের পথ গ্রহণ করে। ১৯৪৮ থেকে ১৯৭২ সালের মধ্যে আরবদের ৪৭৫টি গ্রামের মধ্যে ৩৮৫টি গ্রাম ধ্বংস করে। ১৬,৩০০ আরব গৃহ পুড়িয়ে দেওয়া হয়। এই সময়ের মধ্যেই প্রায় দু'লক্ষ প্যালেস্তিনীয় নিহত হন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এবং তার পূর্বে জার্মানে ইহুদিদের যে ধরনের অত্যাচারের শিকার হতে হয় ইহুদিরাও প্রায় একই ধরনের অত্যাচার শুরু করে প্যালেস্তিনীয়দের বিরুদ্ধে। ১৯৮০ সালে দেখা যায় ছয় হাজার প্যালেস্তিনীয় বন্দী রয়েছেন ইজরায়েলের কারাগারে। এঁদের অনেককেই বিভিন্ন দেশের উদ্বাস্তু ক্যাম্প থেকে ধরে আনা হয়। তাঁদের প্রায় অধিকাংশই ছিলেন বিনাবিচারে বন্দী। ১৯৮১ সালের ১৭ই জুলাই পি এল ও'র মূল সংগঠনের মেরুদণ্ড ভেঙে দেবার সংকল্প নিয়ে বেইরুটে বোমাবর্ষণ করে। একদিনের বোমাবর্ষণে দুশ নরনারী নিহত হন। সেদিন এই হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল। আরব দুনিয়ার অন্যতম বৃহৎ এবং সম্পদশালী রাষ্ট্র প্যালেস্তাইন ১৯৬০-এর দশকের শেষাশেষি অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। আরবরা বিশেষ করে প্যালেস্তিনীয়রা নিজ সত্তাহীন হয়ে পড়েন। প্যালেস্তিনীয় জাতিসত্তা পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবিতে প্রথম জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৫৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় আরব ন্যাশনালিস্ট মুভমেন্ট। এই মুভমেন্ট প্রধানত পরিচালিত হয় ইহুদিবাদের বিরুদ্ধে ইসলামের জেহাদ - এই স্লোগান নিয়ে। কিন্তু ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে পরাজয়ের পর আরব ন্যাশনালিস্ট মুভমেন্ট নিজেদের কার্যকলাপের আদর্শগত পর্যালোচনা করে। তাঁরা স্থির করেন যে, কেবল ইহুদিবাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে সাফল্য অর্জন করা যাবে না। সেজন্য তাঁরা আন্দোলনের মধ্যে অর্থনৈতিক উপাদান যুক্ত করেন এবং নিজস্ব সেনাবাহিনী গঠন করেন। নতুন সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয় - আরব ন্যাশনাল লিবারেশন মুভমেন্ট। প্রায় একই সময়ে দামাস্কাসে প্যালেস্তিনীয় কিছু যুবক প্যালেস্তাইন লিবারেশন ফ্রন্ট নামে একটি সংগঠন গঠন করেন। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আহমদ ইলেরি নামে এক প্যালেস্তিনীয় বুদ্ধিজীবি যুবক। কিছু প্যালেস্তিনীয়দের সংখ্যাগরিষ্ঠের নেতা অল ফতেহ এই সংগঠনের নেতৃত্ব এবং আন্দোলনের রণকৌশল মানতে অস্বীকার করেন। আর একটি পৃথক সংগঠন গঠিত হয় - পপুলার ফ্রন্ট ফর দ্য লিবারেশন অব প্যালেস্তাইন। এই ফ্রন্ট আন্দোলনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংগঠনিক এবং কূটনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ করে। তাদের কর্মসূচীর প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল যে, প্যালেস্তিনীয়দের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার কখনই প্রতিষ্ঠিত হবে না যদি না এই আন্দোলনকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের একটা অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করা যায় ।

১৯৭৩ সালে যখন ইজরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আরবদের কিছুটা অগ্রগতি ঘটে তখন এই গ্রুপ মিলে গিয়ে প্যালেস্তাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন বা পি এল এ ও গঠন করেন যার প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হলেন ইয়াসের আরাফত। এই পি এল ও'র নেতৃত্বেই দীর্ঘদিন ধরে মুক্তি সংগ্রাম চলছে।

ইজরায়েলীদের আক্রমণ এবং নির্যাতন ক্রমবর্ধমানহারে বৃদ্ধি পাবার পটভূমিকায় পি এল ও প্রতিরোধ যুদ্ধের কর্মসূচী গ্রহণ করে। ১৯৮৭ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রতিষ্ঠিত হয় ইন্তিফাদ নামে পি এল ও'র শাখা সংগঠন। ইন্তিফাদ'এর অর্থ হলো পবিত্র অভ্যুত্থান। এটি পি এল ও'র সামরিক শাখাও বলা চলে। এদের নেতৃত্বে পরিচালিত সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ গাজা স্ট্রিপ এবং ওয়েস্ট ব্যাঙ্কের বিস্তীর্ণ অঞ্চল মুক্ত করে। ইয়াসের আরাফতের নেতৃত্বে প্রবাসে প্যালেস্তাইন সরকার গঠিত হয়। সেই সরকারের রাজধানী স্থাপিত হয় তিউনিসে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ এই প্যালেস্তাইন সরকারকে দর্শকের মর্যাদা দেয়।

এদিকে ক্রমাগত যুদ্ধ চালাতে গিয়ে ইজরায়েলের অর্থনীতি ভেঙে পড়ে। সেখানকার গণতান্ত্রিক শক্তি বিশেষ করে কমিউনিস্ট পার্টি অবিলম্বে এই যুদ্ধের দাবি জানাতে থাকে। গত এপ্রিল মাসে ইরাক রাবিন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পাবার পরেই তিনি ঘোষণা করেন যে, মধ্য প্রাচ্যের সব থেকে বড় সমস্যা প্যালেস্তাইন- ইজরায়েল সংঘাতের তিনি অবসান ঘটাবেন। তখন থেকেই কূটনৈতিক পর্যায়ে চলতে থাকে আলোচনার পর আলোচনা। সেই কূটনৈতিক কার্যক্রমেরই ফলশ্রুতি হলো ১৩ই সেপ্টেম্বরের চুক্তি। এই চুক্তি নানাদিক থেকে ঐতিহাসিক হলেও প্যালেস্তিনীয়রা যা দাবি করেছিলেন তার মাত্র ২০ শতাংশ পেরেছেন। তাই অনেকেই অসন্তুষ্ট, অনেকেই বিক্ষুব্ধ।

যখন পশ্চিম এশিয়ায় নতুন করে বিরোধের সূত্রপাত হয়। তখন ইজরায়েল সরকার সিদ্ধান্ত নেয় প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার জন্য জেরুজালেমে একটি সুরঙ্গ খোঁড়া হবে। স্থানটি হচ্ছে আল আক্সা মসজিদের দেওয়াল সংলগ্ন। এই সুরঙ্গ চালু হলে জেরুজালেমের পূর্ব ও পশ্চিম অংশের মধ্যে ভূগর্ভস্থ যোগাযোগ স্থাপনের সুবিধা বাড়বে। শক্ত হবে সমগ্র জেরুজালেমের উপর ইজরায়েলী শাসন ক্ষমতা কায়েম করাব বৈধ ভিত্তি। প্যালেস্তিনীয়দের মতে, জেরুজালেমকে ইহুদি মনোভাবাপন্ন করে তোলার ক্ষেত্রে এই পদক্ষেপ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। জেরুজালেমের বহু এলাকায় আরববাসীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে রাখা হয়েছে। পূর্ব জেরুজালেম তো পশ্চিম উপকূল থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। প্যালেস্তিনীয়দের বক্তব্য : এই সুরঙ্গ চালু করে মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর আঘাত করার চেষ্টা হচ্ছে। খোঁড়াখুঁড়ির দরুন বহুপ্রাচীন আল আক্সা মসজিদের দুর্বল ভিতের যথেষ্ট ক্ষতি হবে।

ইজরায়েল সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সারা পৃথিবীজুড়েই প্যালেস্তিনীয়দের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। প্যালেস্তিনীয় এলাকা ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক ও গাজায় নতুন করে অসন্তোষ দেখা দেয়, বিক্ষোভ, প্রতিবাদ সমাবেশ

হয় নিউইয়র্কে ও ওয়াশিংটনে। সর্বত্রই প্রতিবাদী প্যালেস্তিনীয়রা ঘোষণা করেন : "আমরা যে-কোনো মূল্যে সুরঙ্গ খোঁড়া রুখবো । এই ঘটনায় প্যালেস্তিনীয়দের চাপা পড়া ইস্যুগুলি পুনরায় সংবাদপত্রের শিরোনাম পেতে শুরু করে। আমেরিকায় ভোটের মুখে ক্লিন্টন ভেবেছিলেন পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি এনে রাজনৈতিক ফায়দা তুলবেন। কিন্তু পরিকল্পনাটা ভেস্তে যাওয়ার বরং সমালোচনার মুখেই পড়েন তিনি।

ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর নেতৃত্বাধীন সরকারের প্ররোচনামূলক আচরণ, লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে নতুন করে ইজরায়েলী হানা, সিরিয়ার প্রতি হুমকি, শান্তি চুক্তি অগ্রাহ্য করে জর্ডন নদীর পশ্চিমপারে নতুন করে ইহুদি বসতি স্থাপনের ঘোষণা পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতিকে ক্রমশ জটিল করে তুলেছে। সিরিয়া ও লেবানন তো ইজরায়েলের আচরণে ক্রুদ্ধ, এমনকি মিশরও শান্তি চুক্তি নিয়ে ইজরায়েল সরকারের ভূমিকায় সন্দিহান হয়ে উঠেছে। প্যালেস্তিনীয় নেতারা বলেছেন, ওয়াশিংটনে শীর্ষ বৈঠকে আরাফত যোগ দিয়েছেন নিতান্তই অনিচ্ছাকৃতভাবে। এর আরও একটা কারণ ছিল। তাহলো, শীর্ষ বৈঠকে জর্ডনের বাদশা হুসেনের উপস্থিতি, যার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্যালেস্তিনীয়দের মধ্যে বেশ প্রশ্ন রয়েছে। মিশরের রাষ্ট্রপতিও ওয়াশিংটনের ভূমিকায় আগে থেকেই অসন্তোষ ব্যক্ত করেছেন। ইজরায়েল সরকার শান্তি প্রক্রিয়াকে অচলাবস্থার দিকে ঠেলে দেবার উপযুক্ত সময় বেছে নিয়েছে। ইজরায়েলের বর্তমান শাসক দল, লিকুদ পার্টি নিশ্চিত যে, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী কোনো মার্কিন রাষ্ট্রপতির পক্ষে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে এই মুহূর্তে কোন কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া সহজ হবে না। কারণ, নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সবচেয়ে বড় অর্থ যোগানদার হচ্ছে ইজরায়েলের সমর্থক বৃহৎ ব্যবসায়গোষ্ঠী।

নেতানিয়াহুর নেতৃত্বে ইজরায়েলে নতুন সরকার গঠিত হবার পর থেকেই শান্তি চুক্তি রূপায়ণ নিয়ে সন্দেহ দানা বাঁধতে শুরু করে। ইজরায়েলী নেতৃত্ব চুক্তির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি অগ্রাহ্য করে চলতে থাকে। এর প্রধান হচ্ছে, হেবরন থেকে ইজরায়েলী সেনা সরানো স্থগিত রাখা এবং অধিকৃত জর্ডন নদীর পশ্চিম প্রান্তে নতুন করে ইহুদি বসতি স্থাপন। এভাবে প্ররোচনা দিয়ে ইজরায়েল সরকার প্যালেস্তিনীয়দের মধ্যে অসন্তোষকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। ফলে দু'পক্ষই এখন কার্যত সংঘাতে। পশ্চিম এশিয়ার রাজনৈতিক অবস্থা এখন আর আলোচনার টেবিলে নেই, জটিল প্রক্রিয়া নিতে চলেছে। এর ইঙ্গিত কারও পক্ষেই শুভ হবে না। ইজরায়েল-প্যালেস্তাইন শান্তি প্রক্রিয়া ক্রমাগত ব্যাহত হতে থাকলে পশ্চিম এশিয়ায় নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হবে।

বাঙালীর আন্তর্জাতিকতাবোধের দ্বিধা: প্রসঙ্গ ইজরাইল-প্যালেস্টাইন

অর্জমা ঘোষ

ফিলিস্তিন-ইজরাইল দ্বন্দ্বের প্রেক্ষিতে আলোচনা-সমালোচনার যে ঝড় আবার বাংলার 'ভদ্রলোক পরিসর'-এ ফেরত এসেছে তার মূল বিতর্কবিন্দু হল পক্ষনির্বাচন। বাঙালী 'ভদ্রলোক' তুমি কার দলে? ফিলিস্তিন না ইজরাইল? তবে চারিদিকের তার্কিক চিৎকারের মাঝে বাঙালী ভদ্রলোক চৈতন্যে এই বিশ্বরাজনৈতিক প্রশ্নটির যে একটি অন্য রূপও আছে, যাকে আমরা চরিত্রগতভাবে নানা বর্ণের বলতে পারি, তার ইতিহাস ভুলতে বসেছি। এই ইতিহাস বাঙালী ভদ্রলোকের ক্রমবিবর্তনশীল 'আন্তর্জাতিকতাবোধ'-এর ইতিহাস। এই আন্তর্জাতিকতাবোধ তার আত্মপরিচয়ের সাথে যুক্ত; যার দ্বারা সে তার সমসাময়িক অবস্থানের যৌক্তিকতা প্রমাণ করে। ফিলিস্তিন-ইজরাইল দ্বন্দ্বের শতাব্দীপ্রাচীন ভদ্রলোকী ব্যাখ্যানের ক্রমবিবর্তন আসলে যে ভদ্রলোকের চরিত্রের ক্রমবিবর্তন সেটা মাথায় রেখেই বর্তমান আলোচনা। পরস্পরবিরোধী সহাবস্থানের চেতনা আসলে সরল বাস্তবতা; এই চিন্তা ভদ্রলোক সমাজে আসলে বিরল। তাই সহাবস্থানের যৌক্তিকতা পুরাকল্পীয় নাহলে বিশ্বাস করা যায়না! অন্যদিকে বরং ইহুদী জাতি নিয়ে সংখ্যাগুরু হিন্দু-মুসলমান ভদ্রলোকী বঙ্গমানস বহু আগে থেকেই দ্বিধাবিভক্ত ছিল; ধর্মতত্ত্বের পরিসরে একদিকে হিন্দু বাঙালীর ইহুদী-প্রেম ও অন্যদিকে মুসলিম বাঙালীর ইহুদী-বৈরীতা। মনে রাখা দরকার, দুই ধারনাই আন্তর্জাতিকতাবাদ, বা বলা ভালো আন্তর্জাতিকতাবোধ প্রসূত। ফিলিস্তিন-ইজরাইল দ্বন্দ্বের বঙ্গীয় চৈতনিক অতীত মুসলমান বনাম ইহুদী, এই দ্বিমৌলিক ব্যাখ্যানের নিরিখেই অতীতে চিন্তিত ও আলোচিত হয়েছে। পক্ষনির্বাচনের সূক্ষ্মতা ও স্থূলতার সাথে সাথে সমন্বয়বাদী দিকও ছিল; কিন্তু কোনটিই পশ্চিমি চিন্তার গাঠনিক দ্বিমৌলিকতা থেকে বের হতে পারেনি। দেশভাগের পরের সাম্প্রদায়িক মানসিকতার ছাপ পরেছিল এই ব্যাখ্যানে। সময়ান্তরে স্থূল সাম্প্রদায়িক চিন্তা সরে গিয়ে কসমোপলিটান ভদ্রলোকের ভাবনা যেমন ডমিন্যান্ট ব্যাখ্যান হয়ে থেকেছিল, তেমনই নব্যউদারনীতিবাদের আগমনের পর নতুন ভদ্রলোক স্থূল সাম্প্রদায়িক চিন্তায় ফেরতও গেছে। সে অর্থে 'ইহুদি'-দের সম্পর্কে বদলাতে থাকা চিন্তা বাংলার সাম্প্রদায়িকতার বহুমাত্রিক বাস্তবতার পরিমাপদন্ড হিসাবেও ভাবা যেতে পারে।

আন্তর্জাতিকতাবাদ কিছুটা জাতীয়তাবাদের অনুসারী কালানুক্রমিক ধারণা; যা সব ঔপনিবেশিক বাস্তবতার সাথে মিল খায়না। তাই ঔপনিবেশিক পাকচক্রে আবদ্ধ বাঙালীর নির্মীয়মান বিশ্বচিন্তাকে আন্তর্জাতিকতাবোধ বলাই শ্রেয়। ইহুদীদের নিয়ে যাবতীয় চিন্তা এই বোধের ফল। কারণ ভারতে জনসংখ্যাগত ভাবে ইহুদীরা নগন্য, অথচ তাদের নিয়ে আলোচনার তীব্রতা প্রমান করে বিষয়টির প্রেক্ষিত চরিত্রগতভাবে কোন পরোক্ষ ব্যখ্যানধর্মী। উনবিংশ শতকীয় ধর্ম ও সমাজসংস্কার আন্দোলনের সময়ে একদিকে যেমন বৈদিক হিন্দু ও ইহুদী ধর্মতত্ব থেকে দেবদেবী পর্যন্ত মিলিয়ে

দেখার চেষ্টা হচ্ছিল, তেমনই মুসলিম সংস্কার আন্দোলনে ধীরে ধীরে জায়গা করে নিচ্ছিল ইহুদী-বিদ্বেষ। আধুনিকতা ও ধর্মতত্ব মিলে যে উপাদেয় জগাখিচুরী হিন্দু বাঙালী ভদ্রলোক উনবিংশ শতকে আত্মস্থ করছিল, সে ভিত্তিপ্রস্তরের উপরেই দাঁড়িয়ে ছিল তার আন্তর্জাতিকতাবোধ। রামমোহন-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ হয়ে এই ঔপনিবেশিকতাপ্রসূত আন্তর্জাতিকতাবোধের বিস্তার লাভ করবে বিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত। এই মানসিকতার বিস্তারে জার্মান ইহুদী পন্ডিতদের দীর্ঘ্যদিনব্যাপী আচরিত Indophilia-এর প্রভাবও আছে, যা রবীন্দ্রনাথের বিংশ শতকীয় বিশ্বমানবিকতার আন্তর্জাতিকতাবোধের সাথে যুক্ত হবে। ভারত এর অন্যদিকে প্রায় একই প্রক্রিয়ার বিপরীত ফল দেখা দিল অন্য এক আন্তর্জাতিকতাবোধের জন্মের মাধ্যমে, যা ছিল বাঙালী মুসলমানের আন্তর্জাতিকতাবোধ। বাঙালী মুসলমান ভদ্রলোকের আন্তর্জাতিকতাবোধে 'ইহুদী' যে শত্রু হবে এটা যেমন সরল, তেমনি কসমোপলিটান ভদ্রলোক গোত্রের মধ্যে থাকা হিন্দু বা মুসলমান উভয়েই বিশ্বরাজনৈতিক আন্তর্জাতিকতাবোধের দিকে যাত্রা শুরু করবেন। বাঙালি ভদ্রলোক কমিউনিস্ট হওয়ার পর থেকে এই কসমোপলিটন আন্তর্জাতিকতাবোধ তার ব্যাখ্যানে অন্যমাত্রা যোগ করবে। এই সমর্থন-অসমর্থনের দ্বিমৌলিক খেলাটি আপাতদৃষ্টিতে যতখানি সহজ, প্রকরণ-উদ্দেশ্য-কালভেদে যে তারা যে বহুমাত্রিক ও মাঝে মাঝেই কালদোষসঞ্জাত। তাছাড়া একটি পূর্ববর্তী ব্যাখ্যান পরবর্তী ব্যাখ্যান আসার সাথে সাথেই অন্তর্হিত হয়ে যায়না, বরং দুই ভিন্ন কালের ব্যাখ্যান একে অপরের সাথে মিশে বা বিরোধাভাস তৈরি করে বিষয়টিকে আরো জটিল ও অর্থহীন করে তোলে।

উনবিংশ শতকের বঙ্গমনীষার সাথে সাথে জার্মানীতে থাকা ইহুদী ভারততাত্বিকদের সাংস্কৃতিক উৎসাহ বিষয়টিকে একমুখী হতে দেয়নি। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ থেকে ইউরোপে ভারততত্বের প্রতি যে ঝোঁক দেখা দিয়েছিল, জার্মান-ইহুদী পন্ডিতেরা ছিলেন সে চর্চার প্রথম সারিতে। আসলে ঠিক উনবিংশ শতকেই জার্মানীতে ইহুদী মধ্যবিত্তের মধ্যে Bildungsbegriff নামে শিক্ষাক্ষেত্রের 'নবজাগরণ'-এর শুরু হয়েছিল; মূলত উইলহেম ভন হামবোল্টের নেতৃত্বে লিবারেল আর্টের প্রসারের সাথে সাথে। ঠিক যে অর্থে হিন্দু বাঙালী মধ্যবিত্ত ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে বের হয়ে আধুনিকতা গ্রহণ করছিল, তেমনি তার সমসাময়িক মহাদেশীয় সমান্তরালে জার্মান-ইহুদী মধ্যবিত্ত তার চিরন্তনী গোঁড়ামি থেকে বের হয়ে এসেছিল। অবশ্য এটিকে অন্যভাবেও বিচার করা যায়; বাঙালী যেমন ইংরেজ হতে চাইছিল, তেমনই জার্মানীতে থাকা ইহুদী মধ্যবিত্ত প্রকৃত জার্মান বা 'আর্য্য জার্মান' হতে চাইছিল। সেরূপ সাংস্কৃতিক বিচারে হিন্দু বাঙালী মধ্যবিত্ত ও জার্মান-ইহুদী মধ্যবিত্ত একে অপরের 'ভদ্রলোক'-তুতো ভাই! হিন্দু বাঙালীর 'আন্তর্জাতিকতাবোধ'-এর মতোই, জার্মান-ইহুদী মধ্যবিত্ত ধর্মকেন্দ্রীকতা ত্যাগ করে বৈজ্ঞানিক বিশ্বজনীনতার (Wissenschaft) দিকে প্রায় একই সময়ে যাত্রা করেছিল। উইলিয়াম জোন্সের চিন্তা যেমন হিন্দু বাঙালীর দেশাত্মসন্ধানী 'নবজাগরন'-এর জন্ম দেবে, হার্ডার-সেগেলের

মত জার্মান ভারততাত্বিকদের শিক্ষা বেশ কিছু ভারতআত্মসন্ধানী জার্মান-ইহুদী পন্ডিতদের তৈরি করবে। সংস্কৃত ভাষা প্রাচীনতম ভাষা হিসাবে উঠে এলে হিব্রু ভাষা তার পূর্ববর্তী স্থান হারায়। ইউরোপীয়, মূলতঃ জার্মান Indology ভারতকে সমস্ত সভ্যতা তথা আর্য সভ্যতার জন্মভূমি হিসাবে দেখতে চাইলে এবং পরে ম্যাক্সমুলারের বদান্যতায় ভারততত্বের আলোচনা ক্রমে আর্য্যতত্বের দিকে মোড় নিলে, জার্মান-ইহুদী ভারততাত্বিকেরাও ইহুদীদের আর্য্য ও ভারতীয় সংস্কৃতির সাথে সম্পর্ক প্রমাণে সচেষ্ট হয়ে উঠলেন। জোসেফ গোরেস, গেয়র্গ ফ্রেডরিখ ক্রেউজারের মত অনেকে যেমন ভারত থেকে পারস্য ও প্যালেস্টাইন হয়ে গ্রীসে সভ্যতার আলো ছড়িয়ে পরার কথা বলতে থাকেন, গুস্তভ সলোমন অপার্টের মত অনেকে 'ভারত আক্রমণকারী' আর্যদের সেমেটিক বা ইহুদী প্রমান করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এদের সাথে ভারতীয় পন্ডিতদের বৌদ্ধিক জগতের এক অদ্ভুত মিল তৈরী হবে বিংশ শতকে, যার এক যোগসূত্রে তৈরী হবে বাঙালী হিন্দু ভদ্রলোকের ইহুদী-প্রেমী বিশ্ববোধ; সেকথায় পরে আসছি।

ধর্মসংস্কার পর্বের হিন্দু বাঙালী ভদ্রলোকই আসলে বিংশশতকীয় উদারনৈতিক বাঙালী ভদ্রলোকের সাংস্কৃতিক পূর্বসুরী। আবার বিংশ শতকের বাঙালী ভদ্রলোকের অন্যতম চরিত্র হল তার আন্তর্জাতিকতা, যা কালানুক্রমে নতুন হলেও বৌদ্ধিকস্তরে উনবিংশশতকীয় বিশ্বকল্পনারই অনুরণন। উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ধ্রুপদী ধর্মচিন্তার গভীরে পৌঁছাতে রামমোহনের মত ব্যক্তিত্ব ইহুদী শিক্ষকদের কাছ থেকে হিব্রুচর্চা শুরু করেন। বাঙালী হিন্দুর ধর্মসংস্কার আন্দোলনের সাথে ইহুদী ও হিব্রুচর্চার যোগ তখন থেকেই। রামমোহনের পর কেশবচন্দ্র সেনের সময়ে ব্রাহ্ম সমাজে ইহুদি ধর্মতত্বের চর্চা ও প্রসার ছিল দেখার মত। কেশবচন্দ্রের প্রার্থনায় সে প্রভাব স্পষ্ট;

'হে দয়াসিন্ধু, প্রাচীন ও বর্তমান সময়ের ঈশ্বর, য়িহুদীর জিহোবা, হিন্দুর ব্রহ্ম, তুমি এখানে বিদ্যমান। সকল কার্য্যে বিস্তৃত বিধি দিয়া তুমি যেমন য়িহুদিদিগকে পরিচালিত করিয়াছিলে, বর্তমান ইজরাইল বংশীয়গণকে দৈনিকজীবনসম্বন্ধে আজ্ঞা দিয়া পরিচালিত কর। তোমার পূর্ণ করুণায় আমাদের পরিচালনার জন্য নববিধান প্রেরণ করিয়াছ।'

ধর্মচর্চার পরিসরে ব্রাহ্মরা কৃষ্ণ থেকে চৈতন্যে প্রবাহিত 'প্রেমানন্দ' ও যিহোবা থেকে ইশাতে আসা 'পুণ্যানন্দ'-কে নববিধান ব্রাহ্মচর্চার অংশ করলেন। সমন্বয়বাদী 'ভদ্রলোকি' অতীতের সূত্রপাত এখানে। কলকাতা ক্রিশ্চিয়ান স্কুল বুক সোসাইটির তরফ থেকে অনূদিত 'যিহুদীয় লোকদিগের বৃত্তান্ত সংক্ষেপ সংগ্রহ' (১৮৪৫) ইহুদি পরিচিতির সাধারণীকরণ ঘটায়। উনবিংশ শতকের শেষে অবশ্য 'ব্রহ্ম=যিহোবা' ব্যাখ্যাটি ব্রাহ্মদের সর্ব্বজনস্বীকৃত হয়ে পরে। এটি পরে 'খ্রীষ্ট=কৃষ্ণ' এর মতো ব্যাখ্যানে বদলে যাবে। ১৮৮২ সালের লেখায় নারায়ণকে 'যিহোবা, যোব, যিশু' বলে উল্লেখ করা হবে। সর্ব্বধর্মসমন্বয়ের এই রূপ যে তৎকালীন ভদ্রলোক বাঙালীর মানসজগতে গভীর প্রভাব ফেলেছিল তা প্রকাশ পায় ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা 'সর্ব্ববাদি-

সম্মত স্তোত্র'-এ;

"সকলের পিতা তুমি, তুমি সর্ব্বময়,
সর্ব্ব দেশে পূজ্য তুমি সকল সময়;
জ্ঞানী বা অজ্ঞানী কিংবা সাধু সদাশয়---
কেহ বা যিহোবা, যোব, কেহ প্রভু কয়।"

এ মানসিকতা অবশ্য ১৯৩৬ সালেও প্রবলভাবে উপস্থিত থাকবে। যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের 'রামচন্দ্র ও জরাথুশ্ত্র' গ্রন্থে মূর্তিপূজক ইহুদিদের ক্রমে নিরাকার ব্রহ্ম (যিহোবা) পূজা ও তা থেকে খ্রিষ্টান ও মুসলমান ধর্মের উত্থানের কথা বলবেন। তৎকালীন পন্ডিতদের মধ্যে মহিমাচন্দ্র মজুমদারের মত অনেকে ইহুদিদের ভারতীয় বলতে থাকেন। অবশ্য এটা শুধু বৌদ্ধিক স্তরেই রয়ে গেছিল তা নয়। কলকাতাবাসী সম্ভ্রান্ত ইহুদিদের নবজাগরনীয় ভদ্রলোকের গৃহে যোগাযোগ বেশ পুরোন। শতকের শেষে বিবেকানন্দ তাঁর শিকাগো বক্তৃতায় নিজেকে হিন্দু জাতির প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থাপনের সময় পরিচয় দিচ্ছেন নিপীড়িত ইহুদী জাতির আশ্রয়দাতা হিসেবে। এই ব্যাখ্যানটি পরবর্তীকালে বার বার ফিরে আসবে হিন্দু বাঙালী ভদ্রলোকের আলোচ্য পরিসরে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রতি ভারততাত্ত্বিক ম্যাক্সমুলারের শ্রদ্ধা-ভালোবাসার কথা বেশ পরিচিত। পরবর্তীকালে বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠা ও রোমা রলাঁর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনী প্রকাশের পর যখন বিবেকানন্দের চৈতনিক ধারা প্রতিষ্ঠানিকতা পেলে, তা থেকে বাঙালী হিন্দুর আন্তর্জাতিকতার দ্বিতীয় পরিসর উন্মোচন করে। রামমোহনের সময়ের ব্রাহ্ম বিশ্ববোধের 'ইহুদি' এসে মিলল বিবেকানন্দের হিন্দু বিশ্ববোধের 'ইহুদি'-র ধারণার সাথে। ততদিনে ইজরাইলকে নিয়ে আরব-ইহুদী দ্বন্দ্ব দানা বাঁধতে শুরু করেছে। রোমা রলাঁ পরবর্তীকালে লিখছেন যে এই সময় জে. এইচ. প্রোবস্ত নামে জনৈক আলজেরীয় মাদ্রাসার অধ্যাপক আরব-ইহুদী দ্বন্দ্ব প্রশমনে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সর্বধর্মসারগ্রহীতার গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেন। তাঁর মতে উভয়ের জীবনী পোর্তুগীজ ভাষায় অনুবাদ করে উত্তর আফ্রিকানদের মধ্যে প্রচার করলে হয়তো মধ্যপ্রাচ্যের সমস্যা অন্তর্হিত হবে। রলাঁ তাঁর সাথে বেলুড় মঠের যোগাযোগ করিয়ে দেন, যদিও প্রোবস্ত এমন কিছু করেছিলেন কিনা সেবিষয়ে আর কোন তথ্য পাওয়া যায়না। আসলে রামমোহনের হিব্রুচর্চা থেকে বিবেকানন্দের শিকাগো যাত্রা; বাঙালী হিন্দুর ধর্মতত্ব এক পরোক্ষ ইহুদীপ্রীতির ধারার কথা বলে, যা রাজনৈতিক প্রশ্নের উত্থানের আগে থেকেই প্রচ্ছন্নভাবে উপস্থিত ছিল।

বিংশ শতকের বাঙালীর আন্তর্জাতিকতার প্রধানতম মুখ রবীন্দ্রনাথের ইহুদী-প্রীতি, বিষয়টিকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে, তবে ধর্মতত্বের মননজগত থেকে তখন তা বিশ্বমানবিকতার ব্যাখ্যানে আলোচিত হচ্ছে। বিংশ শতকের বিশের দশকে রবীন্দ্রনাথ ইহুদী ধনকুবের মি. হার্দুন ও ই. এস. কাদুরীর সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক রাখতেন। দ্বিতীয় জন ১৯২৪ সালে সাংহাইতে কবিগুরুকে World Zionist Organisation এর বিশেষ সভায় সম্মানীয় অতিথি হিসাবে আমন্ত্রণ করেন এবং রবীন্দ্রনাথের সে

আলোচনা সভায় উপস্থিত থাকা লন্ডনের The Jewish Chronicle-এ ছাপা হয়। কাদুরী পরে শান্তিনিকেতনের জলসরবরাহ ব্যবস্থার জন্য আট হাজার টাকা অর্থসাহায্য করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বিদেশী বন্ধুদের তালিকায় আইনস্টাইন, উইন্টারনিটশের মত ইহুদী ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি আসলে তাঁর ইহুদী-প্রীতির অন্যতম কারণ। জার্মান ভারততাত্বিক উইন্টারনিটশ রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও শান্তিনিকেতনের অনান্য আশ্রমিক যেমন বিধুশেখর শাস্ত্রী, নন্দলাল বসু, ক্ষিতিমোহন সেন প্রমুখের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। উনবিংশ শতকের Indophilia এভাবেই টিকে ছিল। যদিও ইহুদী-প্রীতি রবীন্দ্রনাথকে অনেকক্ষেত্রে বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন করে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯৩৫ সালে জার্মানীতে গেলে এক জার্মান অধ্যাপক অনুযোগ করেছিলেন যে ইহুদীরা যে 'Internationalism-এর বকুনি' দেয় তাতে আকৃষ্ঠ হয়ে রবীন্দ্রনাথের মতো ভারতীয় এবং ইউরোপীয়রা এসে জার্মান অপেক্ষা ইহুদী পরিবৃত হয়ে থাকতেই পছন্দ করেন। কথাটি মিথ্যাও নয়; ১৯২১ সালে রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন বিখ্যাত দার্শনিক ও জায়নবাদী মার্টিন বুবারের সাথে জায়নবাদ ও ইহুদীদের নিয়ে একাধিকবার আলোচনা করেন যা স্বাভাবিকভাবেই অন্যদের চোখ এড়িয়ে যায়নি। শিক্ষিত, দক্ষিণপন্থী জার্মান সম্প্রদায়ের সুপ্ত রাগের সাথে যুক্ত হয়েছিল নাৎসি প্রোপ্যাগান্ডার অভিনব প্রচার। ১৯২১ সালে রবীন্দ্রনাথ জার্মানী গেলে নাৎসি তরফে প্রচার হতে থাকে যে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতপক্ষে একজন ইহুদী এবং তাঁর আসল নাম রব্বিনাথন্। আরো গুজব ছড়ায় যে বোম্বাই-এর ওপেনহাইমার নামে এক ইহুদী ব্যবসায়ীর পরিবারে বিয়ে করে তিনি প্রচুর অর্থের মালিক হয়েছেন। এই ধরনের প্রচারের কারণ ছিল রবীন্দ্রনাথের জায়নবাদের প্রতি সহানুভূতি। তবে উল্টো দিকে কবির জায়নবাদী দাবির প্রতি সহানুভূতি কখনো মাত্রাতিরিক্ত হয়ে যায়নি। ১৯৩০-এর দশকে রবীন্দ্রনাথ জায়নবাদী হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছেন; এমতাবস্থায় আমেরিকার পত্রিকা The Jewish Standard তাঁর সাক্ষাৎকার নেয়। অবশ্য ততদিনে তিনি তাঁর ১৯২৪ সালের অবস্থান থেকে কিছুটা সরে এসেছেন। জায়নবাদী আন্দোলনের আধ্যাত্মিক বিষয়টিকে সমর্থন করলেও তিনি প্যালেস্তাইন প্রসঙ্গে আরব-ইহুদী সহাবস্থানে 'প্যালেস্তাইন কমনওয়েলথ সরকার' গঠনের কথা বলেন এবং পৃথক ইজরাইল দেশ গঠনের দাবী থেকে জায়নবাদী নেতৃবর্গকে সরে আসতে বলেন।

পরে জার্মানীতে নাৎসি সরকারের ইহুদী অত্যাচারের প্রেক্ষিতে আহত রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৩-এর দিকে ইহুদী সমর্থনে আরো জায়নবাদপন্থী হয়ে ওঠেন, ঠিক যেমন প্রথমদিকে অহিংস অবস্থান নেওয়া আইনস্টাইন পরে ইজরাইল প্রসঙ্গে শক্তিবাদী হয়ে উঠেছিলেন। জার্মানীতে ইহুদীপীড়নের মাত্রা বাড়লে অনেক ইহুদী ছাত্র-শিক্ষক শান্তিনিকেতনে আসতে থাকেন। ১৯৩৭ সালে অ্যালেক্স অ্যারনশন নামে এক ইহুদী শিক্ষক ইংরাজী বিভাগে অধ্যাপকের দায়িত্ব গ্রহন করেন ও কবির মৃত্যুর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে যান। ইনি সত্যজিৎ রায়ের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে অ্যারনশনকে ব্রিটিশ সরকার জার্মান চর সন্দেহে গ্রেফতার করলে কবিগুরু

তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার রেজিনাল্ড ম্যাক্সওয়েলকে চিঠি লিখে তাঁর মুক্তির ব্যবস্থা করেন। এছাড়াও ছিলেন মিস ফ্লাউম নামে এক ইহুদী শিল্পবিশেষজ্ঞ যিনি কলাভবনে যোগদান করেন। ১৯৩৭ সালে রবীন্দ্রনাথ জায়নিস্ট সংস্থার সদস্যদের শ্রীনিকেতনে মডেল ফার্ম তৈরির জন্য আমন্ত্রন জানান, কারণ তাঁর বিশ্বাস ছিল ইজরাইলে যেভাবে উন্নত কৃষির প্রসার তাঁরা ঘটিয়েছেন তা থেকে শ্রীনিকেতনের কর্তৃপক্ষের অনেক কিছু শেখার আছে। ১৯৪০ সালে কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ জেরুজালেম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে শান্তিনিকেতনের ছাত্র ও শিক্ষক বিনিময় প্রক্রিয়ার কথা ভাবেন যদিও তা শুরুর জন্য যুদ্ধের পরবর্তী সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করার কথা ভাবা হয়। অর্থাৎ শান্তিনিকেতন প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের ইহুদী ও জায়নবাদী মিত্রতা এবং বিশ্বযুদ্ধকালে শান্তিনিকেতনের ইহুদী আশ্রয় হিসেবে খ্যাত হওয়া বিদ্যমান। অবশ্য শান্তিনিকেতনি আন্তর্জাতিকতার পথ ধরে জায়নবাদী ইহুদী-প্রীতির সাথে সাথেই ইতিউতি ইউরোপীয় ইহুদী-বিদ্বেষও উঁকি মারতো। সৈয়দ মুজতবা আলি শান্তিনিকেতন প্রসঙ্গে বাগদানভ নামে এক রুশ সাহিত্যের অধ্যাপকের কথা বলেছেন যিনি সোভিয়েত রাশিয়ার ইহুদী-বিদ্বেষের বিরোধীতা করলেও ব্যক্তিগত স্তরে ছিলেন প্রচন্ড অ্যান্টি-সেমেটিক। রবীন্দ্রনাথের ইহুদীঘেঁষা আন্তর্জাতিকতাবোধের ধারাটি দেখা যাবে কবি অমিয় চক্রবর্তীর মধ্যে। ১৯৩৭ সালে জেরুজালেম বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতায় ডাক পাওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলছেন 'নূতন সভ্যতার পত্তন' দেখার 'বহু দিনের ইচ্ছে মিটবে মনে হল'। উচ্ছসিত প্রশংসা করেছেন তুরস্কের সময়ের প্যালেস্তাইনকে 'আধুনিক' করে তোলার প্রক্রিয়া দেখে। তাঁর কথায়, 'আধুনিক কালের য়িহুদীরা প্যালেস্তাইনে এসেছে বিনা অস্ত্রে', 'গড়বার বুদ্ধি নিয়ে'। তাঁর বিশ্বাস, 'আরব-পল্লীর প্রান যদি জাগিয়ে থাকে, য়িহুদী নয়, আরবী নয়, সাম্যধর্মী নূতন প্যালেস্টিনিয়ান সভ্যতা গড়বার কাজে দুই সম্প্রদায়কে মেলাতে চায়, তবেই জানব এরা মানুষের পথ বানাচ্ছে'। অনেকটা গুরুদেবের মতোই তখনো তিনি আরব-ইহুদি কমনওয়েলথে বিশ্বাসী। রবীন্দ্রনাথের মতোই কত ব্যর্থ আশা পোষণ করতেন অমিয় চক্রবর্তী তা বোঝা যাবে তাঁর পরবর্তী প্রতিবেদনে, যেখানে তিনি বিশ্বাসপ্রকাশ করছেন, 'সাম্রাজ্যবাদী য়ুরোপের ধ্বংসমত্ত পায়োনিয়র এরা নয়'। অথচ আরব দাবী নিয়ে তাঁর বক্তব্য অবশ্য অন্য; যেহেতু 'আরবদের মমতা কম', এবং 'নৃশংস হত্যাকান্ড ঘটাতেও ওদের' বাধে না, তাই 'ইহুদী-নেতাকেই যত দূর সম্ভব ঠিক পথে চলতে এবং চালাতে হবে'। তাঁর এমন মনে হওয়ার কারণ? 'প্যালেস্টাইনের ইহুদীরা বহুলভাবে কম্যুনিষ্ট আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত', যেখানে 'আরব ঝুঁকছে ফাসিষ্টতন্ত্রের দিকে'। এছাড়াও বলে গেছেন আরবরা কতখানি সাম্প্রদায়িক এবং ইহুদীরা কতখানি সাম্যচিন্তক কমিউনিস্ট। অমিয় চক্রবর্তীর চিন্তার ধারাটিই দীর্ঘ্যদিন টিকে ছিল বাঙালীমননে; অন্ততপক্ষে রাবীন্দ্রিক-কমিউনিস্ট-হিউম্যানিস্ট মননে। তবে অমিয় চক্রবর্তীর লেখায় একটি নতুন সূত্র পাওয়া যায় যা 'ইজরাইল' ও 'ইহুদি' বিষয়টিতে। বিশ্বায়িত রাজনীতির সূক্ষ্মতা প্রকাশ পেতে থাকে লেখায়। তিনি বলেন যে ইজরাইলের সংশোধনবাদী গোষ্ঠী যা উগ্র জায়নবাদী অবস্থান থেকে সরে আসতে

চাইছে এবং তাদের সমাজতান্ত্রিক চরিত্র আসলে আরব-ইহুদি কমনওয়েলথে বিশ্বাসী। অমিয় চক্রবর্তীর মতো অনেকে এই ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন, যা জায়নবাদী উত্থানের ফলে ব্যার্থ হবে।

স্পষ্টতঃ ইহুদী-হিন্দু বাঙালীর সম্পর্ক যেমন বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে দেখা যাবে, তার বাইরে এক সূক্ষ্ম ইহুদী-প্রীতি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও গড়ে উঠবে। তিরিশের দশকে হাইনরিখ হাইনে বাঙালীর সাহিত্য জগতে ধীরে ধীরে পরিচিত হচ্ছেন। এমন সময়ে বাঙালী সাহিত্য সমালোচক দেবেশচন্দ্র দাশ হাইনের প্রেমকাব্য নিয়ে 'বিচিত্রা' পত্রিকায় আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন যে হাইনে বাঙালীর কাছে 'অসম্ভব অপ্রত্যাশিত নূতন জগত খুলিতে পারিবেন না', কারণ 'ইহুদি বলিয়াই হোক বা রোমান্টিক বলিয়াই হোক' হাইনের প্রেমকাব্যে 'বাঙালী ধারা' স্পষ্ট। 'ইহুদি' বলে বাঙালীর প্রেমের ধারার সাথে হাইনের মিল কি করে হল বোঝা বড় কষ্টসাধ্য। হাইনের মধ্যে এতো বাঙ্গালীয়ানা কেন! আসলে Indophile হাইনের মধ্যে হিন্দু বাঙালী তার নবজাগরণের অতীত খুঁজে পাচ্ছে। আগের মতো স্পষ্ট হিন্দু-ইহুদী সমীকরণের বাইরে সমন্বয়বাদী উদারনৈতিক ভদ্রলোক তার আন্তর্জাতিকতাবোধের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ইহুদীপ্রেম মিলিয়ে নিচ্ছে সাংস্কৃতিক যুক্তিতে। অবশ্য ততদিনে তাত্বিকভাবে এই ইহুদীপ্রীতি উদারনৈতিক ব্যখ্যাণে মিলিয়ে নেওয়া সহজও বলা চলে, কারণ হিটলারের অত্যাচারের কারণে সেসময় ইহুদী সমর্থন পশ্চিমি উদারবাদের অবিচ্ছিন্ন স্বরূপ। বাঙালী ভদ্রলোকের উদারবাদীতার আদর্শগত প্রয়োজন তাকে মিথের অবলম্বন নিতেও এগিয়ে দিয়েছে; Indology-এর আলোচনা এই প্রয়োজনকে পূর্ণতা দিয়েছে। কসমোপলিটান বাঙালীর যেমন Indophilia-সঞ্জাত সূক্ষ্ম ইহুদী-প্রীতি থাকবে, মিথ অবলম্বনে হিন্দু-ইহুদী সম্পর্ক দেখানোর তাগিদও বজায় থাকবে বহুদিন। শুধু এই 'যদু থেকে ইহুদি' মিথটির ভদ্রলোক ভাষ্যে ক্রমিক গমন, এই হেজিমনির ইউরোকেন্দ্রিক চরিত্র ও পরলব্ধ ক্ষমতার প্রসারের দিকটির একটি স্পষ্ট দিক তুলে ধরতে পারে। উনবিংশ শতকে জেমস টড, এলফিনস্টোনের মত ঔপনিবেশিক প্রশাসকদের লেখায় 'যদু থেকে ইহুদি' মিথটি পাওয়া যেতে থাকে, যা পরে বিংশ শতকের সি. সি. ওয়াটশনের মতো প্রশাসকদের মারফত ছড়িয়ে পরে। এই সময় থেকে যদুকে ইহুদী পয়গম্বর আব্রাহামের পূর্বপুরুষ হিসাবে ভাবা হতে থাকে। বালগঙ্গাধর তিলকের মত অনেকে এই মিথ সাগ্রহে গ্রহণ করেন। পূর্বের 'ব্রহ্ম=ইহুদি' মিথটির প্রভাবে বাঙালী ভদ্রলোকও পিছিয়ে ছিলনা এবিষয়ে। উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের বামাবোধিনী পত্রিকায় ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত 'যদুবংশ' রচনায় ১৮৯১ সালে 'যদু থেকে ইহুদি' মিথটির কথা লেখা হয়। প্রবাসী পত্রিকায় ১৯১৪ সালে হিন্দু জপমালার ব্যবহার কিভাবে পারসিক ও ইহুদী ধর্মের মাধ্যমে খ্রিষ্টান ও মুসলমান ধর্মের অংশ হচ্ছে তা নিয়ে প্রবন্ধ লেখা হচ্ছে। ১৯২৫-এ বীরেশ্বর সেন লিখিত 'খ্রীষ্ট ও কৃষ্ণ' প্রবন্ধে ব্রহ্মবাদী বক্তব্যের অনুরণন হিসাবে 'যিহোবা'-এর সাথে কৃষ্ণের মিলের কারণ দেখানো হয়েছে। লেখকের বক্তব্য হল, যেহেতু ইহুদিরা 'যিহোবা'-কে আদোনাই (Adonai) বা পতিসুলভ প্রভু হিসাবে

কল্পনা করে, বৈষ্ণব মতে কৃষ্ণকে স্বামী কল্পনার সাথে তার প্রভূত মিল রয়েছে। ইঙ্গিতটি প্রাচীন এবং স্পষ্ট। ১৯৪০ সালের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় বিমলাচরন দেব তাঁর প্রবন্ধে আরো এক ধাপ এগিয়ে কাশ্মীরীদের ইহুদি প্রমানে সচেষ্ট হলেন। যিশুর কাশ্মীরে আসার মিথকে সামনে রেখে তিনি কাশ্মীরীদের ইজরাইলের শেষ গোষ্ঠীগুলির একটি বলে মনে করেন। ঠিক যেভাবে জার্মান-ইহুদী ভারততাত্বিকরা ভারতের সাথে তাত্বিক সম্পর্ক স্থাপনে উৎসাহী ছিলেন, ঔপনিবেশিক প্রাচ্যবাদ ও আন্তর্জাতিক Indology-এর প্রভাবে থাকা বাঙালী হিন্দু ভদ্রলোকও ইহুদী-ভারত সম্পর্কের মিথিক্যাল রেখাটির প্রতি ততখানিই উৎসাহী ছিলেন।

১৯৩১-৩২ সালে 'মাসিক মোহম্মদী'-র পাতায় জনৈক আব্দুল সাবুদ লিখছেন যে ইহুদী জাতির পূর্বপুরুষেরা ভারতবর্ষের যাদব জাতির শাখা, কারণ নাকি ভাষাগতভাবে 'যদু' থেকেই অপভ্রংশ 'ইহুদী' কথাটি এসেছে। লেখক এখানেই থামলেন না বরং বললেন যে কৃষ্ণের বংশ থেকেই বাইবেলের ভাববাদী সাধকদের প্রশাখাসমূহের জন্ম হয় এবং এই প্রশাখা সমূহের একটি, মক্কার কোরেশ পুরোহিত বংশে হজরত মহম্মদ জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু যুক্তিগতভাবে অপ্রতুল এই সর্বধর্মসমন্বয়-মার্কা কষ্টকল্পনা কেন 'মাসিক মোহম্মদী'-র ন্যায় সাম্প্রদায়িকভাবে অবস্থান স্পষ্ট করা পত্রিকাতেও স্থান পেল? আসলে দীর্ঘ্য 'ভদ্রলোকী' ব্যাখ্যাণের হেজিমনির বাইরে বের হওয়া ততদিনে কঠিন। 'যদু থেকে ইহুদি' ব্যখ্যানের জন্ম Indophilia প্রভাবিত ইউরোপীয় ও হিন্দু বাঙালীর রচনায়। সাবুদ কর্তৃক এই ব্যাখ্যান গ্রহণ আসলে বাঙালী ভদ্রলোকের উদারনৈতিক পরিসরে ইউরোপীয়-হিন্দু ভাষ্যের একাধিপত্যটিকেই স্পষ্ট করে তোলে। সাবুদদের উদারবাদী হওয়ার একমাত্র পথ তখন 'ভদ্রলোকী' সংস্কৃতির হেজিমনি মেনে নেওয়া; ভাষ্যের বাঁধা গতটিকে আয়ত্ব করা। Indology-এর প্রভাবে যে বিশ্ববৌদ্ধিক ভাষ্য তৈরী হচ্ছে তা একদিকে যেমন বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথের সাথে আন্তর্জাতিক যোগসূত্রের সুযোগ এনে দিচ্ছে এবং বাঙালী হিন্দু ভদ্রলোকের আন্তর্জাতিকতাবোধকেও প্রভাবিত করছে, মুসলমান ভদ্রলোকের উদারবাদী হওয়ার জন্য একটি অপরিহার্য্য ভাষ্যের কাঠামো নির্দেশ করে দিচ্ছে। সাবুদ দ্বিতীয় ধারাটির নিদর্শন। এই সমন্বয়বাদী অপরিহার্য্যতা পরে সাম্যবাদী অপরিহার্য্যতা হয়ে যাবে; বজায় থাকবে শুধু 'ভদ্রলোকী' একাধিপত্য। তবে সবাই এই একাধিপত্য মেনে নেয়নি, যদিও ব্যাখ্যানটি প্রতিক্রীয়ার স্তরে 'ভদ্রলোকী' থেকে গেছিল যা বোঝা যাবে আক্রম খাঁর রচনায়। এ আলোচনায় পরে আসছি।

বাংলার হিন্দু ভদ্রলোক বুদ্ধিজীবির ইহুদী-প্রীতির পাশাপাশি মুসলমান ভদ্রলোকের ইহুদী-বিদ্বেষের যে ধারাটি গড়ে উঠেছিল, সেটির সাপেক্ষে বিচার না করলে প্রথম ব্যখ্যানটির ধারাবাহিক গঠনের মনোজগৎ বিশ্লেষণ করা মুশকিল হবে। প্রথমতঃ, ভারতীয় মুসলমানের আন্তর্জাতিকতাবোধ বহুপূর্ব থেকেই ইহুদী-বিদ্বেষী; এই সহজ সত্যটি অবশ্য স্বীকার্য্য। দ্বিতীয়তঃ, বাঙালী মুসলমান 'মুসলমান আন্তর্জাতিকতাবোধ'-এর পক্ষে যাবে নাকি বাঙালী স্বকীয়তার প্রশ্নে পৃথক

থাকবে এই দ্বন্দ্বে আচ্ছন্ন থেকেছে বিংশ শতক জুড়ে। হায়দ্রাবাদের 'মুসলমান আন্তর্জাতিকতাবোধ' যেমন ছিল প্রকৃতার্থেই প্যান-ইস্লামিস্ট, তেমনই ইহুদি-বিদ্বেষী। মৌলানা শওকত আলি ১৯৩১ সালে অটোমান সুলতান-খলিফার সাথে দেখা করতে যাচ্ছেন এক বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াসে; হায়দ্রাবাদের নিজামের দুই ছেলে ও খলিফার মেয়েদের মধ্যে। খিলাফত প্রশ্নে বিভেদ দেখা দিলে এবং কেন্দ্রীয় আইনসভায় মুসলমান প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে সমস্যা দেখা দিলে শওকত আলির নিকট বন্ধু মহম্মদ আলি ১৯২৮ সালে বিপরীত পক্ষকে 'বেনিয়া' ও 'ইহুদী' বলে গালি দেন। ভারতের প্যান-ইস্লামিস্ট মানসিকতায় 'ইহুদী' তখন একটি গালি বিশেষ। বাংলায় এই ইহুদীবিরোধী মানসিকতার প্রভাব প্রচ্ছন্নভাবে কার্য্যকর ছিল; প্রচ্ছন্নতা কাটবে দেশভাগের পর। আসলে ভাষাগত ব্যবধানের কারনে 'মুসলমানি' বাংলায় লেখা ভদ্রলোক পরিসরে আলোচনা ১৯৩০-এর আগে সেভাবে আসেনি। একমাত্র 'মাসিক মোহাম্মদী' এই ভাষার স্বকীয়তার পক্ষে কথা বলে, যদিও দেশভাগের পর এই ব্যবধান বাড়বে। ভাষা ও বিষয়ের দিক থেকে দেখতে গেলে ধর্মতাত্ত্বিক ক্ষেত্রে সহজাত ইহুদি-বিদ্বেষ ছিল, ঠিক যেমনটি ছিল মধ্যযুগের ইউরোপের ক্ষেত্রে। হজরত মহম্মদের উপর লিখিত জীবনীগুলিতে স্বাভাবিক ভাবেই ইহুদি-বিদ্বেষের কাহিনী থাকত। যেমন ১৯১৬ সালে শেখ মোহম্মদ জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ রচিত 'শ্রেষ্ঠ নবী হজরত মোহাম্মদ ও পাদ্রীর ধোঁকা ভঞ্জন' গ্রন্থে ইহুদি কর্তৃক নবীকে বিষ প্রয়োগের চেষ্টা, ছলনা, ও পরাজয়ের কথা আছে। একইভাবে ১৯১৩ সালে শেখ আবদর রহিম রচিত 'হজরত মহম্মদের জীবন-চরিত ও ধর্ম্মনীতি'-তেও ইহুদিদের বিশ্বাসঘাতকতার গল্পে পরিপূর্ন। ১৯১৩ সালে বিখ্যাত সাহিত্যিক মীর মোশারফ হোসেন রচিত 'মদিনার গৌরব' কাব্যগ্রন্থে কাব্যের ভাষায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে সহজাত ইহুদি-বিদ্বেষ। হোসেন সেখানে লিখেছেন,

'হজরতের উদারতা প্রেম সর্ব্ব জনে,
দেখি ইহুদিরা হিংসা করিলেক মনে'।
'প্রকাশ্যে বন্ধুতা ভাব শত্রুতা গোপনে,
ইহুদি স্বভাব এই জানে সর্ব্বজনে'।

তবে এই বিদ্বেষ ধর্মতাত্ত্বিক ভাবে সহজাত, কারণ খ্রিষ্টান ও মুসলমান উভয় আব্রাহামিক ধর্মেই ইহুদিদের শত্রুতার নজরে দেখা হয় তাদের ইতিহাসগত পরস্পর সাপেক্ষ অতীতের ভিত্তিতে। মধ্যযুগের ইউরোপীয় নাটকে এই প্রকার সহজাত ইহুদি-বিদ্বেষ ও তার ফলশ্রুতি হিসাবে নৈমিত্তিক ইহুদি-পীড়নের ঘটনা ঘটত। ঠিক যেমন মহম্মদের জীবনগাথায় ইহুদি কর্তৃক নবীকে অত্যাচারের গল্প আছে, একইভাবে ইষ্টারের আগে (মার্চ-এপ্রিল) সপ্তাহব্যাপী লেণ্ট বা সংযমপালনের সময় 'প্যাশন প্লে' ঘরানার নাটকে যীশুর উপর ইহুদিদের করা নানা রকম অত্যাচারের আবেগাত্মক প্রচার করা হত। যার ফলে মাঝে মাঝেই উত্তেজিত সাধারণ খ্রিষ্টান নিকটবর্তী ইহুদি মহল্লায় চড়াও হত। অষ্টাদশ শতকের দিকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র এই প্যাশন প্লের বিষয়টি নিয়ন্ত্রনে আনেন।

অবশ্য নাৎসি রাজত্বে হিটলারের প্রচেষ্টায় এই প্রকার প্যাশন প্লে চালিয়ে যাওয়ার উৎসাহ আরো বাড়ে। শেষ পর্যন্ত ১৯৬৫ সালে ভ্যাটিকানের ঘোষনার দ্বারা বলা হয় যে যীশুর মৃত্যুর জন্য জাতিগতভাবে ইহুদিরা দায়ি নয়। এরপর থেকে এই নাটক বন্ধ হতে থাকে। আসলে সুপ্ত জাতিহিংসা চিরকালই চিত্তবৃত্তিতে উপস্থিত থাকে; ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর দ্বারা উৎসেচিত হওয়ার অপেক্ষায়। বাংলায় ইহুদিদের উপস্থিতি এত কম যে সহজাত ধর্মতাত্বিক ইহুদি-বিদ্বেষ প্রযুক্ত হওয়ার সুযোগ পায়নি। কিন্তু প্রত্যক্ষ হিংসা না হোলেও, দূরবর্তী ও প্রায় অদেখা অথচ প্রচন্ড শত্রুভাব নিয়ে দেখা এক জাতিসম্পর্কে মুসলমান ভদ্রলোক সহজাতভাবে সহানুভূতিশীল হবেনা এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এই বিদ্বেষ প্রত্যক্ষ নয়, কারণ ১৯২১ সালের আদমশুমারি অনুসারে বাংলায় ইহুদিদের সংখ্যা ১৮৫১ জন। প্রায় অদৃশ্য একটি জনগোষ্ঠীর প্রতি প্রত্যক্ষ বিদ্বেষ অসম্ভব, তাই বাংলার মুসলমানের কাছে ইহুদি-বিদ্বেষ বিমূর্ত, দূরবর্তী, এবং কেতাবী। সে হিসাবে হিন্দু বাঙালীর কাছেও ইহুদিরা দূরবর্তী একটি জাতি, যাদের প্রতি ভদ্রলোক হিন্দুর ভালোবাসা একইভাবে দূরবর্তী ও কেতাবী। নাহলে ইহুদী-তন্ত্রের উগ্র পৈত্তোলিকতা-বিরোধী অবস্থান কখনোই দূর্গাপূজার আচারপালনকারী বাঙালীর মনোমত হতো না, যদিনা ইহুদিদের অবস্থান ও তাদের সাথে সম্পর্ক এতখানি অপ্রত্যক্ষ না হতো।

পূর্বোক্ত আব্দুল সাবুদের বক্তব্যকে যদি হিন্দু 'ভদ্রলোকী' ব্যাখ্যানের প্রভাবে প্রভাবিত মুসলমান বক্তব্য হিসাবে ভাবি, তার উল্টোদিকে দাঁড়িয়েছিলেন স্বয়ং মহম্মদ আক্রম খাঁ, 'মাসিক মোহম্মদী'-র সম্পাদক ও মুসলিম লিগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ইহুদি ও খ্রিস্টান প্রসঙ্গকে আক্রম খাঁ সহজেই হিন্দু বনাম মুসলমান করতে পেরেছিলেন, তাঁর হিন্দু ভদ্রলোক পূর্বসুরীদের ধর্মতাত্বিক পথেই। সমস্যা হল হিন্দু ভদ্রলোক যখন সময়ের দাবীতে ধর্মতাত্বিক সমন্বয়বাদকে অসাম্প্রদায়িক করতে চেষ্টা করে চলেছিল, হিন্দু 'ভদ্রলোকী' ব্যাখ্যানের প্রতিক্রিয়ার প্রয়াসে আক্রম খাঁ সাম্প্রদায়িক পথ গ্রহণ করলেন। আক্রম খাঁ 'মোস্তফাচরিত' গ্রন্থে খ্রীষ্টান আলোচনায় ইসলামের উপর ইহুদি ও খ্রীষ্টান প্রভাবের বাহুল্যকে অস্বীকার করেন। তিনি আরো বলেছেন যে, ইবন এহশাকের মতো কিছু শাস্ত্রজ্ঞের জন্য ইহুদি ও খ্রীষ্টান ধর্মপুস্তক থেকে অনেক কিছু নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছেন, যা পরিত্যাজ্য। আক্রমের গোঁড়ামির শেষ এখানেই নেই; বরং 'রোমান, গ্রীক, হিন্দু, ইহুদি' জাতির কুসংস্কারাচ্ছন্ন অবস্থার দিকে ইসলামের গতির কথা বলতে থাকেন। একটু বিরোধী অবস্থান থেকে হলেও, আক্রম খাঁর ইহুদী বিদ্বেষ ধর্মতাত্বিক সমভাবনায় হিন্দুবিদ্বেষ হতে বেশি সময় নেয়নি।

সমস্যা হল মুসলমান ভদ্রলোক যখন আন্তর্জাতিকতাবোধ বিষয়ে নিজের অবস্থান গ্রহণ করতে অগ্রসর হয় তাকে হিন্দু ভদ্রলোকের সমন্বয়বাদের ব্যাখ্যান অথবা মুসলমান ধর্মতাত্বিক আন্তর্জাতিকতার কোন একটিকে গ্রহণ করতে হয়। ফ্যাসিবাদবিরোধী ও প্রগতিশীল বাঙালী বুদ্ধিজীবি আন্দোলনে থাকা গোলাম কুদ্দুসের মত অনেক মুসলমান ব্যক্তিত্ব ছিল একথা যেমন ঠিক, তেমনই মূলধারার ইহুদি-বিদ্বেষকে সরিয়ে নিজস্ব ধারার প্রগতিশীল বক্তব্য রাখার মতো পরিস্থিতি তাঁরা

পাননি। ফলস্বরূপ হিন্দু ভদ্রলোকের সমন্বয়বাদ ও উদারনীতির অপরিহার্য্য কাঠামো মেনে চলতে হয়েছে, অথবা থাকতে হয়েছে দ্বিধাজরীত অবস্থানে। দেশভাগের পরের চিত্রে এই অসহায়তা দৃশ্যমান। আনিসুজ্জামান তাঁর আত্মজীবনীতে মসজিদে যাওয়ার অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে বলেছেন যে একদিন ইমাম সাহেব জুম্মার খোতবার পর কাশ্মির ও ফিলিস্তিনের মুসলমানদের মুক্তি কামনার সাথে সাথে ইহুদি ও হিন্দুর উপর 'আল্লাহ্‌র লানত যেন নেমে আসে, সেই প্রার্থনা করলেন'। আনিসুজ্জামান মসজিদ যাওয়া বন্ধ করলেন এই ভেবে যে 'যিনি মানুষের দুর্দশা চান', তাঁর পিছনে নামাজ পড়া যায় না। তবে ব্যক্তিস্তরে যা অভ্যাস করা সম্ভব তা কি সামুহিক স্তরে আচরণ করা যায়! ১৯৬৯ সালে পূর্ব পাকিস্থানে জামাত গুন্ডা দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার পর মওলানা ভাসানী ঢাকার তেজগাঁও বন্দরে অবতরণ করলে বামপন্থী ছাত্র-কৃষক-শ্রমিক জনতা লাল ঝাণ্ডা হাতে স্লোগান দিল,

'সড়িগলি সরকার কো এক ধাক্কা ঔর দো। এক মওদুদী - লাখো ইহুদি। ভাসানী - লাল সেলাম'।

এখানে প্রশ্ন হল, মার্ক্সবাদী ভাসানী, যিনি সদ্য জামাত কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে এসেছেন, তাঁর সভায় 'এক মওদুদী - লাখো ইহুদি'-এর মতো ইহুদি-বিদ্বেষী স্লোগান ওঠে কি করে! আসলে যে বিষয়টি মূলধারার আলোচনায় বসে গেছে তা সাম্প্রদায়িক হলেও জনসাধারন অবচেতনেই গ্রহন করে। ভাসানী হয়তো জানতেন, কিন্তু সেখানে তাঁর কিছু করার ছিলনা। স্বাধীন বাংলাদেশের অবশ্য পরে আর হিন্দু ভদ্রলোকের ভাষ্যের কাঠামো ব্যবহারের প্রয়োজন ছিলনা, তাই আন্তর্জাতিকতাবোধের প্রসঙ্গে প্যান-ইসলাম ফিরে আসে সহজেই। আনিসুজ্জামানরা ততদিনে 'মাইক্রস্কোপিক মাইনোরিটি'।

ইতিমধ্যে বিশ্বযুদ্ধ ও বাংলার প্রগতিশীল ফ্যাসিবাদ বিরোধীতা চল্লিশের দশকের বাঙালী ভদ্রলোকের ইহুদী সহানুভূতিকে আরো বাড়িয়ে দেবে। সাম্প্রদায়িক দেশভাগ সেই সহানুভূতিকে সমানুভূতি করে তুলবে বৃহত্তর হিন্দু উদ্বাস্তুদের কাছে। নাৎসি পীড়নে ইউরোপের ভিটামাটি ছেড়ে পলাতক ইহুদীদের সাথে ছিন্নমূল বাঙালী নিজের অবস্থানের মিল খুঁজে পেল। সলিল সেন লিখলেন 'নতুন ইহুদি' নাটক। কানু বন্দোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'নতুন ইহুদি' নাটকে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় আত্মপ্রকাশ করলেন এবং সে সময়ে প্রবল সাড়া ফেলেছিল এই নাটক। ১৯৪৮ সালে নতুন ইজরাইল দেশ তৈরী হওয়ার সাথে সাথে ছিন্নমূল ইহুদীদের অভিযোজনের আবেগাত্মক অনুরণন ঘটিয়েছিলেন দেশভাগ পরবর্তী উদ্বাস্তুদের 'নতুন ইহুদি' বলার মাধ্যমে। অবশ্য এসময় থেকে ব্যাখ্যানে অদ্ভুত মিশ্রণ দেখা যাবে। একদিকে পুরোন ইহুদি-প্রেম, অন্যদিকে রাজনৈতিক সত্য মিলিয়ে এই সময় থেকে ইজরাইল-প্যালেস্তাইন বিষয়ে বক্তব্য বাঙালীর আন্তর্জাতিকতাবোধের দ্বিধা চরমে পৌঁছাবে। এক চমৎকার নিদর্শন হল ১৯৬৮ সালের 'প্রবর্তক' পত্রিকার আষাঢ় সংখ্যার সম্পাদকীয়। সম্পাদকীয় বক্তব্যে ইজরাইল-প্যালেস্তাইন বিরোধ নিয়তির

ফল বলার সাথে সাথে, সেমেটিক অসহিষ্ণুতা, ইউরোপ-আমেরিকার দূর্বুদ্ধি, ইহুদি সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র, সমাজতান্ত্রিক ব্যার্থতাজনিত জায়নবাদী উত্থান, এবং ইজরাইলে উদারনীতির স্থান না থাকাকে দায়ী করা হয়। তারই সাথে বলা হয়েছে ভারতে দীর্ঘ্য সময় ইহুদিরা কি চমৎকার সৌহার্দ্য পেয়েছে। প্রসঙ্গে এসেছে ১৯৬৮ সালে 'স্টেটসম্যান' পত্রিকাতে আলোচিত ভারতে ইহুদি আগমন ও শান্তিপূর্ন বসবাসের ১৯০০ বৎসরপূর্তির বিষয়টি। নানাবিধ ব্যাখানের স্তরীকরণ কিভাবে হচ্ছে তা স্পষ্ট হবে এখানে। আসলে স্বাধীনতাত্তোর কসমোপলিটান ভদ্রলোক তখন মোটামুটি কমিউনিস্ট হচ্ছে, তাই বিংশ শতকের প্রথম দিকের ইহুদি-প্রেমী উদারনীতিবাদকে সরিয়ে সমাজতন্ত্রী বিশ্ববোধের দৃষ্টিতে দেখা শুরু হবে এসময় থেকে। ইতিমধ্যে ইজরাইল ১৯৭৬ সালে নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতন্ত্রী বলে প্রকাশ করলে কমিউনিস্ট বাঙালীর উৎসাহ প্রকাশ পেয়েছিল। নবজাগরণের সময়ের ইহুদী-প্রীতির সাথে যোগ হয়েছিল সমাজতন্ত্রী আশা। সত্তরের দশকে স্তালিনের ইহুদি-বিদ্বেষ ও রাশিয়ায় ইহুদি পীড়নের বিরোধিতা করতে দেখা যাচ্ছে বাঙালীদের; বিষয়টিকে দেখা হচ্ছে সমাজতন্ত্রী ব্যর্থতা হিসাবে। তাত্বিক সমস্যা দেখা দেবে ১৯৯১-এর পর থেকে, যখন ইজরাইল নিজেকে ইহুদী রাষ্ট্র ঘোষনা করবে। এই সময় থেকে বাঙালী সমাজের মূলধারার রাজনীতি সহজেই ইজরাইলের ভয়ঙ্কর যুদ্ধবাদী মানসিকতার বিরোধী অবস্থান নেবে। কিন্তু কমিউনিস্ট অবস্থান কখনোই কোন একটি জাতি বা রাষ্ট্রের বিরোধী হতে পারেনা, তাই ১৯৯০-এর আগে পর্যন্ত ধনতান্ত্রিক কাঠামোর থেকে দেশের জনগণকে আলাদা করে দেখার প্রবনতা বাঙালী কমিউনিস্টদের লেখনীকে প্রভাবিত করবে। কমিউনিস্ট পার্টির বেআইনি থাকার সময় বিশ্ব রাজনীতি প্রসঙ্গে তাঁদের অবস্থান ছিল গণপন্থী। পত্রপত্রিকায় লেখা হয়;

"ভারতবর্ষ, ইরান, সিরিয়া, লেবানন, ইজরাইল, ইরাক ও মিশরের মা-বোনেরা! জাতীয় মুক্তি ও গণতন্ত্রের জন্য লড়াই কর; শান্তির প্রধান প্রহরী সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধবাদীরা তোমাদের দেশকে আক্রমণের ঘাঁটি বানাচ্ছে, তাদের এই কাজ বন্ধ কর।"

কসমোপলিটন বাঙালী সহজেই এই ব্যখ্যান গ্রহন করবে, যাঁদের মধ্যে বেশ কিছু মুসলমান ভদ্রলোকও যোগ দেবেন এক অন্য ধরণের ব্যাখ্যানের আশায়। সমস্যা হল প্রথাবদ্ধ দ্বিমৌলিকতার হাত থেকে বের হওয়ার ক্ষমতা এটিরও ছিলনা। আবার পুরোন সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যানকে সম্পূর্ন সরিয়ে দেওয়ার শক্তিও ছিলনা এই বক্তব্যে। আসলে বিরোধ-প্রতিবিরোধের এই ন্যারেটিভ নির্মানের খেলায় অদ্ভুতভাবে বাঙালীর সাম্প্রদায়িকতার আয়না হয়ে উঠেছিল ইজরাইল-প্যালেস্টাইন। তাঁর আভ্যন্তরীণ দ্বিধাই আসলে আন্তর্জাতিকতাবোধের দ্বিধা হয়ে ফিরে এসেছে নানা সময়ে, নানা ব্যাখ্যানে। অতীতের ইহুদি-প্রেমের ফলে তাই হিন্দু বাঙালী যেমন প্যালেস্টাইনকে সমর্থনে দ্বিধান্বিত, তেমনই সাম্প্রদায়িকতার সাথে মানবতাবাদী ব্যাখ্যান মিশে গিয়ে অপর বাংলা আজ প্যালেস্টাইন-সমর্থনকারী হলেও, আসলে বৈরীতাগত

ঐক্য এবং যুক্তিগত প্রকরণের মধ্যে এক বিস্তর দূরত্ব থেকে যাচ্ছে। তাই আসলে বিষয়টি পক্ষনির্বাচনের নয়; কারণ বাঙালীর চৈতনিক পরিসরে কাল্পনিক এই দুই পক্ষের আবিস্কার তো ভদ্রলোকের দ্বিমৌলিকতার ফলাফল। বাংলার সামান্য যে কয়েকটি ইহুদি নিদর্শন রয়ে গেছে তা আঁকড়ে পড়ে রয়েছে তো মুসলমান সাধারণ। নাহুমের কেক শিল্পীরা থেকে ইহুদি সিনাগগের রক্ষণাবেক্ষনকারীরা তো মুসলমান জনসাধারন। অভদ্রলোকের সমন্বয়বাদ অবশ্য ভদ্রলোকি ব্যাখ্যানে স্থান পায়না। তাই কেতাবী পক্ষনির্বাচন তো ভদ্রলোকের ন্যারেটিভ-নির্মিত বাংলার সাম্প্রদায়িক বাস্তবের প্রতিবিম্বে দেখা হয়, সেটাকে বিশ্বজনীন বাস্তবের দিক থেকে দেখাই উচিত। যদিও বাঙালী ভদ্রলোকের অতীত সেকথা বলেনা।

গাজার লড়াই উপনিবেশের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা যুক্তফ্রন্ট

অর্ক ভাদুড়ি

১

মধ্য লন্ডনের অভিজাত স্যাভয় হোটেলের সামনেটা ভিড়ে থিকথিক করছে। নিরাপত্তারক্ষীরা সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। রাস্তার উল্টোদিকে ঘোড়সওয়ার পুলিশ। দু'পাশের দেকানপাট, রেস্তোরাঁ, হোটেলের ব্যালকনি থেকে উঁকি দিচ্ছে উৎসুক মানুষের মাথা। অক্টোবরের এক শনিবারে মধ্য লন্ডনের অত্যন্ত অভিজাত এই চত্বরে কোনও যানবাহন চলছে না। দু'পাশে তাকালে কেবল মানুষ আর মানুষ। হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মানুষ হাঁটছেন প্যালেস্টাইনে ইজরায়েলের গণহত্যা বন্ধের দাবিতে। কাতারে কাতারে মানুষ। কেউ সাদা, কেউ কালো, কেউ হলুদ বা বাদামি। ব্রিটিশ এবং ব্রিটেনে বসবাসকারী আরবরা তো আছেনই, সেই সঙ্গে আছেন লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা, দক্ষিণ এশিয়ার হাজার হাজার মানুষ। আছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের লোকজন- কট্টর কমিউনিস্ট থেকে শান্তিবাদী, কুর্দ জাতীয়তাবাদী থেকে ইসলামিস্ট- কে নেই এই জনজোয়ারে!

সামনে দিয়ে আড়াই বছরের ছেলেকে প্যারাম্বুলেটরে বসিয়ে হাঁটছেন ফতিমা। ৩২ বছরের যুবতী থাকতেন গাজার আল নুসিরাতে। ২০১৮ সাল থেকে থাকেন লন্ডনে। মায়ের ওভারকোটের একটি প্রান্ত আঁকড়ে ধরে যুদ্ধবিরোধী মিছিলে হাঁটছে তাঁর ৬ বছরের মেয়ে। তার হাতে প্যালেস্টাইনের পতাকা। বুকের প্ল্যাকার্ডে যুদ্ধ বন্ধের দাবি।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার এক সপ্তাহ পর থেকে পরিবারের কারও যোগাযোগ নেই ফতিমার। সকলের ফোন বন্ধ। শেষ যখন কথা হয়েছিল, বাবা মাহমুদ জানিয়েছিলেন, মুহুর্মুহু বোমা পড়ছে। রাত্রিবেলা চোখ ঝলসে যাচ্ছে বিস্ফোরণে। আশেপাশের প্রায় সব বড় বড় বিল্ডিং ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে। খাবার নেই। ইলেকট্রিসিটি নেই। জল নেই। রাস্তায় রাস্তায় মলমূত্র উপচে পড়ছে। একের পর এক আত্মীয়-বন্ধুর মৃত্যুসংবাদ আসছে প্রতিদিন। সাক্ষাৎ নরককুণ্ড পরিণত হয়েছে গাজা- ফতিমার বেড়ে ওঠার শহর। অবশ্য বেড়ে ওঠার গোটা সময়কালটাই বোমা-গুলি আর প্রিয়জনের রক্তাক্ত মৃতদেহ দেখার স্মৃতিতে মাখামাখি।

ফতিমা বলছিলেন, তাঁরা বৃদ্ধ বাবা মাহমুদ ভেবেছিলেন স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণ গাজায় যাওয়ার চেষ্টা করবেন। তাছাড়া আর কোনও উপায়ও ছিল না কারণ ইজরায়েলের সেনাবাহিনী উত্তর গাজার সব বাসিন্দাকে দক্ষিণে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। আমার সঙ্গে প্রথম কথাবার্তা যেদিন হয়, বাবা-মা কোনও নিরাপদ আস্তানায় যেতে পেরেছেন কিনা, আদৌ বেঁচে আছেন কিনা, ফতিমা কিছুই জানতেন না। পরদিন থেকে যোগাযোগ বন্ধ। খবর পেয়েছেন ইজরায়েলের ট্যাংক ঢুকেছে গাজায়। বোমাবর্ষণের তীব্রতা আরও বেড়েছে। হাসপাতালে লাশের পাহাড়। আইসক্রিমের ফ্রিজারে উপচে পড়ছে লাশ, কারণ মর্গে জায়গা নেই। ছোট ছোট শিশুরা ঘুমোতে যাওয়ার আগে হাতে নিজেদের নাম লিখে রাখছে, যাতে বেওয়ারিশ লাশ হতে না হয়। ফতিমা সেদিন বলছিলেন, "আমার স্বামী আটকে আছেন বেইরুটে। ওর সঙ্গে আমার বড় ছেলেটা থাকে। বাকি দুই সন্তানকে নিয়ে আমি লন্ডনে। প্রতি শনিবার ওদের সঙ্গে নিয়ে হাঁটছি যুদ্ধবিরোধী মিছিলে। আমার বাবার জন্য হাঁটছি। মায়ের জন্য হাঁটছি। বন্ধু আর পরিজনদের জন্য হাঁটছি। ওরা কেউ হামাস নয়। প্রতিদিন যে অসংখ্য শিশু মারা যাচ্ছে, তারা কেউ হামাস নয়।"

তারপর আরও তিনবার আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে ফতিমার। দ্বিতীয়বার আমরা বসেছিলাম ডাউনিং স্ট্রিটের খুব কাছেই একটা কফিশপে। আমি ওর মেয়েকে উপহার দিয়েছিলাম চকোলেট। তৃতীয়বার আমি ভিডিও কলে কথা বলেছিলাম ফতিমার ইঞ্জিনিয়ার স্বামীর সঙ্গে। চতুর্থবার ফতিমা আমায় জানিয়েছিল, ওর বাবা-মা দু'জনেই মারা গিয়েছেন ইজরায়েলের হামলায়।

আমি প্রশ্ন করেছিলাম, 'বৃহস্পতিবার বাবা মায়ের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে তুমি শুক্রবার মিছিলে এলে! কেন?' ফতিমা উত্তর দিয়েছিল, 'আমার বাবা-মায়ের মতো আরও অসংখ্য ফিলিস্তিনি বাবা মায়ের জন্য। উপর থেকে আমার বাবা, মা দেখছেন,

তাঁদের মেয়ে ভয় পায়নি।'

ফতিমার মতো লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতি শনিবার জড়ো হচ্ছেন লন্ডনে। দাবি জানাচ্ছেন অবিলম্বে গাজায় ইজরায়েলের সামরিক অভিযান বন্ধ করতে হবে। হামাসের উপর আক্রমণের নামে হাজার হাজার শিশুকে খুন করা যাবে না। মিছিলে হাতে হাতে ঘুরছে মৃত শিশুদের নাম, ঠিকানা, বয়স। কারও নাম আয়াত ফেরওয়ানা। বয়স ১ মাস। বাড়ি ছিল গাজার আলরিমালে। কারও নাম মিশক জৌদা। ৩ বছর বয়স। থাকত আল নুসিরাতে। এমন আরও অসংখ্য নাম, অজস্র ঝলসে যাওয়া মুখ, নিথর শরীরে লগ্ন হয়ে থাকা অসহায় হাত।

২

ইজরায়েলে হামাসের হামলা হয়েছিল ৭ অক্টোবর। হামলা বলব, নাকি প্রতিআক্রমণ? ১৯৪৮ সালে প্রথম নকবা। ইউরোপের হলোকাস্ট-পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে আরবদের সম্মতি ছাড়াই তাদের বুকের উপরে তৈরি হয়ে গেল একটা নতুন দেশ- ইজরায়েল। অবশ্য সলতে পাকানো শুরু হয়েছিল অনেক আগেই। ১৯১৭ সালে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড আর্থার ব্যালফোর জায়নবাদী নেতা ব্যারন রথসচাইল্ডকে চিঠি লিখে জানান, প্যালেস্তাইনে ইহুদি আবাসভূমি গড়ে তুলতে যা প্রয়োজন, তাই করবে ব্রিটিশ সরকার।

ব্যালফোর ঘোষণা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ অটোমান সাম্রাজ্যের দখলে থাকা প্যালেস্তাইন ভূখণ্ড প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে ইংরেজদের হাতে চলে যায়। এই ভূখণ্ডে আগে থেকেই আরব মুসলমানদের পাশাপাশি সংখ্যায় কম হলেও খ্রিস্টান এবং ইহুদিরা বসবাস করতেন। এই ইহুদিরা ছিলেন অধিকাংশই প্রাচ্যের ইহুদি, যারা 'মিজরাহি' নামে পরিচিত ছিলেন। উনবিংশ শতকের শেষদিক থেকে এই ভূখণ্ডে ইউরোপ থেকে ইহুদিরা আসতে থাকে, যারা 'আশকেনাজি' নামে পরিচিত। ব্যালফো-র ঘোষণাপত্রের পরে বহিরাগত ইহুদিদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। তারা স্থানীয় আরবদের থেকে জমিজমা কিনে বসবাস করতে শুরু করে। পশ্চিমি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে জায়নবাদীদের মাখামাখির সেই শুরু।

১৯২১ সালেই ব্রিটিশদের প্রত্যক্ষ মদতে হাগনাহ নামে আধাসামরিক বাহিনী তৈরি হয়। পরে আরও দু'টি জায়নবাদী সশস্ত্র সংগঠন - 'ইরগুন' এবং 'স্টার্ন গ্যাং' গড়ে ওঠে। এই সংগঠনগুলোর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে ভারতের রণবীর সেনা বা সানলাইট সেনার সঙ্গে। কার্যকলাপও একই রকম আরবদের উপর সন্ত্রাস চালানো, খুন, লুটপাট, ধর্ষণ করে আতঙ্ক সৃষ্টি করা। মজার বিষয় হল, ১৯৪৮ সালে ইজরায়েল রাষ্ট্র গঠনের পর এই সংগঠনগুলি ইজরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনীতে মিশে যায়।

কবে থেকে শুরু হয়েছে ইজরায়েলের জায়নবাদী রাষ্ট্রের হাতে ফিলিস্তিনিদের গণহত্যা? ১৯৪৮ সালে। ইজরায়েলের জন্মলগ্ন থেকেই। ১৯৪৮ সালের ১০ মার্চ ইজরায়েলের প্রথম প্রধানমন্ত্রী বেন গুরিয়ানের নেতৃত্বে প্ল্যান ডি নামে একটি পরিকল্পনা

করে জায়নবাদীরা। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী হাগনাহ, স্টার্ন গ্যাং সমেত জায়নবাদী সংগঠনগুলি হত্যা, ধর্ষণ, লুটতরাজের মাধ্যমে গোটা অঞ্চলে বিপুল সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। মার্চ থেকে অক্টোবর পর্যন্ত সাড়ে সাত লক্ষ ফিলিস্তিনি আশপাশের আরব দেশগুলিতে উদ্বাস্তু হিসাবে আশ্রয় নেয়। বেশ কিছু জায়গায় দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে কিছু ইহুদিও মারা যায়। এর মধ্যেই মে মাসে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হলে গুরিয়ান স্বাধীন ইজরায়েল রাষ্ট্র ঘোষণা করেন। ১৯৯৮ সালে জায়নবাদীরা যখন ইজরায়েলের জন্মের ৫০ বছর পালন করছেন, তখন থেকেই আরবরা ১৫ মে তারিখটিকে 'আল নকবা' বা 'বিপর্যয়' হিসাবে পালন করেন। এরপর প্রতিটি যুদ্ধে পশ্চিমি মদদপুষ্ট ইজরায়েল জয় পেয়েছি। বর্ণনাতীত যন্ত্রণায় ঝলসে গিয়েছে ফিলিস্তিনিদের জীবন। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে গাজা এবং ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক দখল করে নেয় ইজরায়েল। তারপর ক্রমশ বেড়েছে নির্যাতন। মার খেতে খেতে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া ফিলিস্তিনিরাও প্রতিরোধ করেছেন। আটের দশকের প্রথম ইন্তিফাদার ঝড় শান্ত হয়েছে ১৯৯৩ সালের অসলো চুক্তিতে। তারপর ২০০০ সালের পর দ্বিতীয় ইন্তিফাদা। ২০০৫ সালে ইজরায়েল খাতায় কলমে গাজা এবং ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক থেকে চলে গেলেও আসলে সেগুলি উন্মুক্ত কারাগার।

ফিলিস্তিনি প্রতিরোধের নেতৃত্বে দীর্ঘসময় থেকেছে ইয়াসের আরাফতের ফাতাহ্। পিএলও-র প্রধান শক্তি ছিল এই ধর্মনিরপেক্ষ সংগঠন। সেই সঙ্গে আরও অনেক স্রোত। ফিলিস্তিনের কমিউনিস্টরা যেমন ছিলেন, তেমনই গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসাবে ছিলেন বামপন্থী গেরিলা বাহিনী পিএফএলপি বা ডিএলএফপি। ১৯৯৩ সালের অসলো চুক্তির পর থেকেই ফাতাহ্-র জনপ্রিয়তায় ভাটার টান। কারণ ইজরায়েল অসলো চুক্তির কোনও শর্ত মানেনি। ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে অবৈধ দখলদারি বাড়িয়েছে দিনের পর দিন। ফিলিস্তিনিরা অনুভব করেছে ফাতাহ্ বা প্যালেস্টাইন অথরিটি তাঁদের স্বাধীন মাতৃভূমি এনে দিতে পারবে না। এই শূন্যতায় দ্বিতীয় ইন্তিফাদার পর হামাসের উত্থান।

৭ অক্টোবরের হামলার কি হামাসের একক কৃতিত্ব? না। কয়েক মাস আগেই লেবাননে বৈঠক করেছে হামাস, ইসলামিক জিহাদ এবং বামপন্থী গেরিলা পিএফএলপি। তৈরি হয়েছে গাজার ঐক্যবদ্ধ কম্যান্ড। ইজরায়েলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামে এই তিনটি শক্তি যেমন আছে, তেমনই আছে আগে ফাতাহ্-র সঙ্গে থাকা আল আকসা মার্টিয়ার্স ব্রিগেড। প্রতিরোধ হচ্ছে ওয়েস্ট ব্যাঙ্কেও। লায়ন্স ডেন, জেনিন ব্রিগেডের মতো আর্বান গেরিলা দলগুলি লড়াই করছে একটানা।

৩

হামাসের হামলার পরেই দ্রুত প্রতি আক্রমণ শুরু করেছিল নেতানিয়াহুর সরকার। বৃষ্টির মতো বোমাবর্ষণ।হামাসের বিরুদ্ধে অভিযানের নামে আদতে গোটা গাজাকেই মুছে দেওয়ার চেষ্টা শুরু হয়েছে। বসতি এলাকা, স্কুল, উদ্বাস্তু শিবির, হাসপাতাল-

কোনও কিছুই রক্ষা পাচ্ছে না বোমার হাত থেকে। মৃত্যু হয়েছে ১৪ হাজারেরও বেশি মানুষের। মৃতদের প্রায় অর্ধেক শিশু বা কিশোর। গোটা উত্তর গাজার লক্ষ লক্ষ বাসিন্দাকে বলা হয়েছে দক্ষিণে সরে যেতে। প্রাণের ভয়ে ছুটতে থাকা সেই উদ্বাস্তু জনতার উপরেও বোমা ফেলেছে যুদ্ধবিমান।

সাক্ষাৎ নরকে পরিণত হওয়া গাজার পাশে দাঁড়ানোর আলোচনা শুরু হয়েছিল যুদ্ধ শুরুর ঠিক পরেই। বিলেতের প্যালেস্টাইন সলিডারিটি ক্যাম্পেন নামে একটি মঞ্চ দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয় ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক এবং গাজার বাসিন্দাদের মানবাধিকার রক্ষায়। তাদের সঙ্গে এলেন ইরাক-আফগানিস্তানের যুদ্ধের বিরোধিতায় অন্যতম প্রধান ভূমিকা নেওয়া স্টপ দ্য ওয়র কোয়ালিশনের লোকজন। এলেন ব্রিটেনের প্রায় সবকটি প্রধান ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা। এলেন লেবার পার্টির প্রাক্তন নেতা জেরেমি করবিনের অনুগামীরা। এলেন চিত্র পরিচালক কেন লোচ-সহ একঝাঁক যুদ্ধবিরোধী ব্যক্তিত্ব। এলেন বিভিন্ন বামপন্থী দল এবং গোষ্ঠী- কমিউনিস্ট পার্টি, সোস্যালিস্ট পার্টি, সোস্যালিস্ট ওয়ার্কাস পার্টির সদস্যরা। আর বিরাট সংখ্যায় এলেন ইহুদিরা। তাঁদের বক্তব্য, ইজরায়েল একটি জায়নবাদী রাষ্ট্র। তাঁরা ইজরায়েলের যুদ্ধনীতি, গাজার গণহত্যা সমর্থন করেন না। সমর্থন করেন প্যালেস্টাইনের সাধারণ মানুষের স্বাধীন ভাবে বেঁচে থাকার অধিকার। এক কথায় বলতে গেলে, খুব দ্রুত ব্রিটেনের বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধবিরোধী গোষ্ঠীগুলি একটি মঞ্চে হাতে হাত ধরে দাঁড়াল। ঠিক যেমন দাঁড়িয়েছিল ২২ বছর আগে, 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' শুরুর দিনগুলিতে।

প্রথম কর্মসূচির ডাক দেওয়া হল যুদ্ধ শুরুর ঠিক এক সপ্তাহ পর- ১৪ অক্টোবর। এলাকায় এলাকায় ছোট ছোট বৈঠক, অনলাইনে প্রচার। ইউনিয়নগুলি ব্রাঞ্চে ব্রাঞ্চে প্রচার করল মিছিলের। জমায়েতের সময় ছিল বেলা ১২টায়। সাড়ে ১০টা থেকে আসতে শুরু করলেন মানুষ। লন্ডন এবং তার আশেপাশের অঞ্চলের ফিলিস্তিনিদের পাশাপাশি হাজারে হাজারে এলেন প্রতিবেশী আরব দেশগুলির বাসিন্দারা। লম্বা টুপি, কালো কোটের বিনুনী বাঁধা ইহুদিরা এলেন। তাঁদের হাতে ব্যানার, 'নট ইন আওয়ার নেম'। কাতারে কাতারে এলেন বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যরা। লেবার পার্টির নেতা কের স্টামার সরাসরি ইজরায়েলকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্ত মানতে রাজি নন পার্টির অনেকেই। পদত্যাগ করেছেন একাধিক লেবার পার্টির কাউন্সিলর। স্টামারের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন একাধিক সাংসদ। খোদ শ্যাডো ক্যাবিনেটের সদস্যরা দাবি তুলেছেন অবস্থান বদলের। তাঁরা এলেন। লন্ডনের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এলেন বহিষ্কৃত লেবার নেতা করবিন অনুগামী হিসাবে পরিচিত লেফট লেবারের লোকজন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্টরা লন্ডনে সক্রিয়। তাঁরা এলেন নিজেদের পতাকা নিয়ে। খোদ প্যালেস্টাইনের মাটিতে দাঁড়িয়ে ইজরায়েলের সঙ্গে লড়াই করছে দুটি বামপন্থী গেরিলা সংগঠন - পিএফএলপি এবং ডিএফএলপি। তাঁদের প্রবাসী শাখার প্রতিনিধিরা এলেন। লিভারপুলের তারকা মহম্মদ সালাহ-সহ একাধিক ফুটবলার মুখ খুলেছেন গাজায় চলমান গণহত্যার বিরুদ্ধে। প্রিমিয়ার লিগের

ম্যাচে গ্যালারিতে উড়েছে প্যালেস্টাইনের পতাকা, গণহত্যা বিরোধী পোস্টার। স্কটল্যান্ডের সেল্টিকের প্রতিটি ম্যাচে গ্যালারি সেজে উঠছে ফিলিস্তিনি পতাকায়। মিছিলেও তাই পা মেলাল ময়দান। বিরাট ব্যানারজুড়ে লেখা হল, 'যুদ্ধ ও বর্ণবাদ বিরোধী ফুটবল'।

এই শুরু। গাজায় মৃতদেহের পাহাড় দেখে লন্ডন ফিরল দুই দশক আগের প্রতিবাদী অবতারে।

প্রথম শনিবারে জমায়েত হল দেড় লক্ষ। দ্বিতীয় শনিবারে তিন লক্ষ। ইজরায়েলের স্থল অভিযান শুরু হওয়ার পর তৃতীয় শনিবারের ৫ লক্ষ, চতুর্থ শনিবারে ৮ লক্ষ যুদ্ধবিরোধী জনতার ঢেউ ভাসিয়ে দিল গোটা মধ্য লন্ডন। প্যালেস্টাইন সলিডারিটি ক্যাম্পেনের চেয়ারপার্সন বেন জামাল বলছিলেন, "এই শতাব্দীর শুরুর দিকের যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলনের ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনছে লন্ডন। টনি ব্লেয়ারের আমলে যেমন লক্ষ লক্ষ মানুষ যুদ্ধের বিরুদ্ধে পথে নামতেন, এবারও ঠিক তেমন করেই মিছিলে হাঁটছেন বিপুল সংখ্যক মানুষ। প্রতিটি মিছিল ছাপিয়ে যাচ্ছে আগের দিনের মিছিলকে।"

এই বিপুল যুদ্ধবিরোধী জনতার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল, তার বহুমাত্রিকতা। এই ভিড় সংগঠিত নয়, স্বতঃস্ফূর্ত। মিছিলে আসা লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে রয়েছে পরস্পরবিরোধী রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি আনুগত্য। ট্রাফলগার স্কোয়ারের ঠিক সামনে জাতীয় পতাকা শরীরে জড়িয়ে হাঁটছিলেন তুরস্কের শাসক এরদোগানের সমর্থকরা। তাঁদের ঠিক পাশেই কুর্দিস্তানের সমর্থকরা। বছরের পর বছর কুর্দ গেরিলারা সশস্ত্র লড়াই করছেন এরদোগানের বিরুদ্ধে। এই চলমান যুদ্ধ নিয়েও তাঁদের অবস্থান যুযুধান। কিন্তু দুই পক্ষই মিছিলে মিলেছেন গণহত্যা বন্ধের দাবির সমর্থনে। ইজরায়েলের অভিযোগ, ইরান সমর্থন করছে হামাসকে। অথচ মিছিলে শামিল ইরানের বিলুপ্তপ্রায় তুদে পার্টির প্রবাসী সমর্থকরা। শামিল শিয়াখাল গেরিলাদের উত্তরসূরীরা। এই দুই বামপন্থী শক্তিই ইরানের ইসলামিক বিপ্লবের পর বিপুল নির্যাতনের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ। কিন্তু ইরানের শাসকদের মতো তাঁরাও ফিলিস্তিনের পক্ষে। বিলেতের বিভিন্ন কমিউনিস্ট গোষ্ঠী লাল পতাকা হাতে মিছিলে শামিল। তাঁদের পাশেই কমিউনিস্ট চীনের উইঘুর মুসলিমদের উপর হওয়া অত্যাচার বন্ধের দাবিতে ব্যানার হাতে হাঁটছেন হিজাব মাথায় তরুণী। সাতরঙা নিশানের ছায়ায় নমাজ পরতে বসলেন একদল মানুষ। যুযুধান সব মতাদর্শের আশ্চর্য সমাহার! সব পথ এসে মিলেছে যুদ্ধ ও গণহত্যা বন্ধের দাবিতে।

মিছিলের শুরু থাকে। শেষ থাকে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে চলতে থাকে মিছিল। কখনও উথালপাথাল ঢেউ। কখনও শান্ত। মিছিলের গোটা শরীরময় আশ্চর্য সব চরিত্রদের ভিড়।

প্রথম ইন্তিফাদায় তিন সন্তানকে হারানো ইয়াসের এখন বৃদ্ধ। রামাল্লার বন্ধুদের সঙ্গে তিনি হাঁটছেন। ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে ইজরায়েলের হামলায় দুই পা হারানো তরুণী

হাঁটছেন হুইলচেয়ারে। প্রথম নকবায় দেশ ছেড়ে প্রবাসে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন যে কিশোর, তাঁর বৃদ্ধ হাতে স্বাধীন প্যালেস্টাইনের পোস্টার। দৃষ্টিহীন প্রেমিকের হাত জড়িয়ে হাঁটা যুবতীর স্লোগান দিচ্ছেন "ফ্রি ফ্রি প্যালেস্টাউন", তাঁর আবরণ উড়ে যাচ্ছে ভেজা হাওয়ায়।

হাঁটতে হাঁটতে মনে হয় গোটা আরব দুনিয়া টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে লন্ডনের রাস্তায়। ইয়াসের বলছিলেন, "এই যুদ্ধ ফিলিস্তিনিরা শুরু করিনি। আজ থেকে ৭৫ বছর আগে এই যুদ্ধ আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। নাৎসিদের পাপের শাস্তির ক্রুশকাঠ বসানো হয়েছিল আমাদের কাঁধে। বিনা দোষে। আমাদের বসতভূমি কেড়ে নিয়ে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল ইজরায়েলকে। তারপর থেকে ক্রমশ সংকুচিত হয়েছে আমাদের ভূখণ্ড। মার খেতে খেতে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে আমাদের। আমরা যুদ্ধ চাই না। আমরা কেবল স্বাধীন অস্তিত্ব নিয়ে বেঁচে থাকতে চাই।"

৪

মিছিলে হাঁটছিলেন ৭৬ বছরের আব্বাস। একসময় লড়াই করেছেন পিএলও-র হয়ে। হামাসের তীব্র বিরোধী এই বৃদ্ধ বলছিলেন, "ধর্মনিরপেক্ষ আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গত তিরিশ বছরে দুর্নীতিগ্রস্থ, আপসকামী এবং জরাগ্রস্ত হয়ে পড়ায় হামাসের এই উত্থান। আটের দশকে পিএলও-কে দুর্বল করতে ইজরায়েলের মদতে হামাস তৈরি হয়েছিল। আজ সে নিজের স্রষ্টাকে দংশন করছে।" ইয়াসের বলছিলেন, "নয়ের দশকের শুরুতে স্বাক্ষর হওয়া অসলো চুক্তির কোনও শর্তই ইজরায়েল মানেনি। প্রথম ইন্তিফাদার পর পিএলও এবং রামাল্লার প্যালেস্টাইন কর্তৃপক্ষ কার্যত আত্মসমর্পণ করেছে ইজরায়েল এবং পশ্চিমী শক্তিগুলির কাছে। সেই শূন্যতা ভরাট করেছে হামাস। কিন্তু হামাস বা পিএলও-কে দিয়ে গোটা ফিলিস্তিনি জনতার যন্ত্রণাকে বোঝা যাবে না। হামাস ধ্বংস হতে পারে, পিএলও ধ্বংস হতে পারে, গোটা গাজা, ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক শ্মশান হতে পারে, কিন্তু স্বাধীন প্যালেস্টাইনের স্বপ্ন ধ্বংস হবে না। প্রজন্মের পর প্রজন্মে তা বহমান থাকবে।"

গোটা মিছিলজুড়ে অসংখ্য ইহুদি। তাঁদের মধ্যেই দেখা হয়ে গেল ৮২ বছরের এস্থারের সঙ্গে। তাঁর বাবা, মা দু'জনেই বন্দি ছিলেন মিউনিখের কাছে ডাখাউ কন্সেন্ট্রেশন ক্যাম্পে। পেশায় চিকিৎসক এস্থার জিউস ভয়েস ফর লেবারের সঙ্গে যুক্ত। কেন এসেছেন মিছিলে? এস্থার হাতের পোস্টার তুলে ধরলেন। তাতে লেখা, নট ইন মাই নেম। বৃদ্ধা বললেন, "এই নির্বিচার গণহত্যার দায় ইজরায়েলের জায়নবাদী শাসকের। দায় দখলদারির রাজনীতির। আমার মতো অসংখ্য ইহুদি মনেপ্রাণে এই গণহত্যাকে ঘৃণা করি।" এস্থারের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন ইজরায়েলের নাগরিক সারা। তিনিও ইহুদি। হামাসের হামলার হারিয়েছেন নিজের ঘনিষ্ঠতম দুই বন্ধুকে। সারা বললেন, "হামাসের হামলার তীব্র নিন্দা করি। কিন্তু তা দিয়ে আমার দেশের সরকারের এই গণহত্যা বৈধতা পায় না। সাড়ে ৭ দশকের দখলদারি বৈধতা পায়

না। ২০১৪ সালের স্মৃতি আমার মনে এখনও দগদগে। ইজরায়েলি বোমারু বিমান যখন আমাদের করের টাকায় প্যালেস্টাইনের শিশুদের ঝলসে দিচ্ছিল, তখন পাহাড়ি এলাকায় পর্যাপ্ত পানীয় এবং খাবার-সহ সরাসরি সেই দৃশ্য উপভোগ করছিলেন আমারই কিছু সহনাগরিক। গোটা পৃথিবী সেই ঘটনার ছবি দেখেছে। সেই দিন থেকে আমি প্যালেস্টাইনের মানুষের অধিকারের পক্ষে পথে নামি।"

দু'দশক আগের ব্রিটেন আর আজকের ব্রিটেনের ফারাক অনেক। সার্বিকভাবেই যুদ্ধবিরোধী রাজনীতির প্রভাব কমেছে বিশ্বজুড়ে। হিংসা যত সহজলভ্য হয়, ততই কমে তার অভিঘাত। স্মার্টফোন বাহিত হয়ে গণহত্যার ছবি যখন নিয়মিত বাসা বাঁধে মগজে, তখন বোধহয় তার আবেদন কমে যায়। নাপাম বোমার ঝলসানো ভিয়েতনামি শরীর যে অভিঘাত সৃষ্টি করতে পারত, ইন্টারনেট বিপ্লবের পর হোয়াইট ফসফরাসে পোড়া ফিলিস্তিনি শিশু সম্ভবত ঠিক ততখানি অভিঘাত তৈরি করতে পারে না। তার পরেও লন্ডন উত্তাল হচ্ছে যুদ্ধের বিরুদ্ধে। কেবল লন্ডন নয়, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে পথে নামছেন মানুষ। তবে জমায়েতের বিচারে সবার আগে থাকছে লন্ডন, ঠিক দু'দশক আগের মতোই। লাখ লাখ মানুষের এই মিছিলের কোনও নির্দিষ্ট মতাদর্শ নেই। আছে ফকির-মিশকিনের বহুবর্ণ আলখাল্লার মতো এক বোধ, যা মানবতার কথা বলে, হাজার হাজার শিশুর মৃত্যুমিছিল থামিয়ে দিতে চায়।

৫

প্যালেস্টাইনের প্রতিরোধ সংগ্রামকে বুঝতে হবে তার বহুমাত্রিকতায়। হামাস, পিএলএফপি বা ফাতাহ্- সকলেই ফিলিস্তিনি জনতার কোনও বা কোনও অংশের প্রতিনিধি। এরা জনবিচ্ছিন্ন সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী নয়। পপুলার সাপোর্টের উপর ভিত্তি করেই এদের লড়াই। হিজবুল্লার সঙ্গে যেমন লেবাননের কমিউনিস্টদের বিপুল মতপার্থক্য এবং সংঘাত। কিন্তু জায়নবাদীদের বিরুদ্ধে তাঁরা একজোট। লেবানিজ কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নেতা নাদের আওয়াদের সঙ্গে কথা হচ্ছিল লন্ডনের রাস্কিন হাউজে। নাদের বলছিলেন, 'মধ্যপ্রাচ্যের সংকটকে সেখানকার বাস্তবতার নিরিখেই বিচার করতে হয়। হিজবুল্লার সঙ্গে সংঘাত বিপুল। কিন্তু তাতে জায়নবাদ বিরোধী ঐক্যে সমস্যা নেই। তারাও আমাদের মতোই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তি। আজ যদি আমায় কেউ প্রশ্ন করেন, আমি কীসের পক্ষে? আমি বলব, আমি প্রতিরোধের পক্ষে। সেই প্রতিরোধ বামপন্থী হতে পারে, ইসলামিস্ট হতে পারে, সেকুলার হতে পারে। প্রতিরোধ হল প্রতিরোধ।"

গাজার লড়াই আসলে উপনিবেশের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা যুক্তফ্রন্ট। তার সংহতি আন্দোলনের চরিত্রও তেমনই। প্রতিরোধের ধরণই এমন। সংকীর্ণবাদের বিলাসিতা তাকে মানায় না।

ব্রান্ড বয়কটের রাজনীতি ও মার্কিন পুঁজি

অরণি ঘোষ

ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের দ্বৈরথ আজকের নয়। দীর্ঘ পঞ্চাশ বা তারও বেশি সময় ধরে চলা এই অসম যুদ্ধে একদিকে আছে আমেরিকা অর্থায়িত ইসরায়েলি সরকার ও অন্যদিকে আছে ফিলিস্তিনের মুক্তিকামী মানুষ। এবং এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে আমেরিকার সরকারের আর্থিক এবং সামরিক সাহায্যের পিছনে অর্থের যোগান আছে সেই দেশের কিছু বিরাট বড় মেগাকর্পোরেশনের । তাই এই দৈরথ আজ আবার করে পৃথিবীকে এক প্রশ্নের মুখে এনে ফেলেছে ? আমাদের নিত্যদিনের প্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদহনের এবং সর্বরহের সিংহভাগ নিয়ন্ত্রণ করে এই বৃহৎ পুঁজি । তাহলে আমরা এই পণ্য ও পরিষেবা যখন ব্যবহার বা উপভোগ করি, তখন কি আমরা আসলে এই পুঁজিবাদকেই তোল্লাই দিচ্ছি এই নিধনযজ্ঞে ঘি ঢালতে? আমার কেনা ম্যাকডোনাল্ডসের বার্গারটা কি আসলে মোসাদকে অর্থ যোগাচ্ছে এই যুদ্ধ রূপী খুন চালানোর জন্য? এখান থেকেই এই পুঁজিবাদী সভ্যতার উঠোনে আনাড়ি অশ্বত্থ গাছের চারার মতো গড়ে উঠতে আরম্ভ করে ব্র্যান্ড বয়কটের ডাক ।

কিন্তু একটু ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে ব্র্যান্ড বয়কটের ডাক আসলে বার বার ফিরে এসেছে নানান আকারে ও প্রকারে । ইসরায়েলি হামলাকে প্রত্যাখ্যান করার পাশাপাশি আরো বহু ঘটনাকে কেন্দ্র করে বারে বারে পৃথিবীর নানান নিপীড়িত মানুষ ডাক দিয়েছেন এই মেগাকর্পোরেশন নিপাত যাক।

কোভিড প্যান্ডেমিকের সময় আমেরিকায় বহুল প্রচলিত কেলগস কোম্পানি তাদের শ্রমিকদের থেকে তাদের প্রাপ্য নূন্যতম অধিকারগুলি ছিনিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করে। লোকডাউনের সময় কোম্পানির বহু কর্মচারীকেই সপ্তাহে সাত দিন ১৬ ঘন্টা কাজ করতে হয় বিশ্বজোড়া চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে যোগান দিতে। বদলে প্রাপ্য মজুরি তো জোটেইনি, বরং উল্টে কোম্পানি তাদের অবসরকালীন সুযোগ, ছুটির বেতন, স্বাস্থ সুরক্ষার মত সুবিধা কমিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রচুর কর্মীকে ছাঁটাই করারও হুমকি দিতে থাকে কেলগস কর্তৃপক্ষ। এর প্রতিবাদে বেকারি, কনফেক্শনারি, টোব্যাকো ওয়ার্কার্স এন্ড গ্রেন মিলারস ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন হরতালের ডাক দেয়। তারই সাথে টুইটার জুড়ে ডাক ওঠে কেলগস বয়কটের।

এই কেলগসের সাথে ব্র্যান্ড বয়কটের ডাক এর আগে এবং পরে পরে বহুবার যুক্ত হয়েছে। কেলগসের বিরুদ্ধে অভিযোগের তীর ওঠে যে তারা GMO বা জেনেটিক্যালি মডিফাইড সীড ব্যবহার করে তাদের নানান শুকনো খাবার বানানোর ক্ষেত্রে । তাই আবারো সেই কেলগস বয়কটের স্বীকার হয়।

এই কেলগসের সাথে ব্র্যান্ড বয়কটের ডাক এর আগে এবং পরে পরে বহুবার যুক্ত হয়েছে। কেলগসের বিরুদ্ধে অভিযোগের তীর ওঠে যে তারা GMO বা জেনেটিক্যালি মডিফাইড সীড ব্যবহার করে তাদের নানান শুকনো খাবার বানানোর

ক্ষেত্রে । তাই আবারো সেই কেলগস বয়কটের স্বীকার হয়।

খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুতকারক সংস্থাদের মধ্যে ব্র্যান্ড বয়কটের টার্গেটের মুখে পড়েছে এরম নামের তালিকা বড়োই সুদীর্ঘ। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম হলো ওয়েনডিজ। ২০১১ সালে ফেয়ার ফুড প্রোগ্রাম নামক একটা সহাবস্থানকরি উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই উদ্যোগের মাধ্যমে চাষিদের সাথে যে কোম্পানিগুলি ফসল কেনে তাদের একটা স্বচ্ছ পরিকাঠামোর মধ্যে একে অন্যকে পরিষেবা আদান প্রদানের লক্ষ্য স্থির করা হয়। কিন্তু ওয়েনডিস্ এই ফেয়ার ফুড প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করতে শুরু থেকেই গড়িমসি করে। ২০২১ সালে একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনার সামনে আসা আবার নতুন করে একটা আন্দোলনের সূচনা করে। জানা যায় যে ওয়েনডিস্ আসলে আমেরিকা ও মেক্সিকোর বহু অঞ্চলে এই একবিংশ শতাব্দীতে এসেও এক প্রকার দাসত্বপ্রথা চালাচ্ছে । বিপুল পরিমান কৃষিশ্রমিক ফ্লোরিডা অঞ্চলে সংগঠিত হয়ে একটা আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করে। এবং সেখানেও আমরা খুব উল্লেখযোগ্য ভাবে ওয়েনডিস্ বয়কটের ডাক শুনতে পাই।

ইতিহাসের নানান সময়ে ইসরায়েল সরকারকে সাহায্য করেছে আমেরিকার বহু বহুজাতিক সংস্থা। ২০২৩ সালে বয়কট ডিভেস্টমেন্ট, স্যাঙ্কশন বা বি ডি এস মুভমেন্ট নতুন করে ব্র্যান্ড বয়কটের ডাক দেয়। বি ডি এস মুভমেন্ট হলো ফিলিস্তিনের সংহতিতে বানানো একটি মঞ্চ যেটা এই পৃথিবীজোড়া নানান বহুজাতিক সংস্থাকে নানান মূলত কিছু স্তরে ভাগ করেছে। এর মধ্যে কিছু কোম্পানি এমন আছে যেগুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। তাদের মধ্যে অবশ্যই আছে গুগলের মতন কোম্পানি। কিন্তু আবার এমনও কিছু কোম্পানি আছে যাদেরকে আমরা চাইলে নির্দ্বিধায় আমাদের জীবন থেকে ছেঁটে ফেলতে পারি। এই কোম্পানির তালিকায় আছে আহাভার মতন কসমেটিকস প্রস্তুতকারক কোম্পানি, আছে এইচ পি - র মতন সফটওয়্যার ও কম্পিউটার প্রস্তুতকারক কোম্পানি, আছে অ্যাক্সার মতন বিমা কোম্পানি সহ স্টারবাকস ও ম্যাকডোনাল্ডসের মত ফাস্ট ফুড চেন।

আহাভা ডেড সি ল্যাবরেটরিজ দ্বারা পরিচালিত একটি কসমেটিকস প্রস্তুতকারক সংস্থা হল আহাভা। আহাভা আন্তরজাতিক আইন লঙ্ঘন করে ওয়েস্ট ব্যাংকের ইজরায়েলি অধিকৃত জমিতে তাদের কারখানা চালায়। এই অঞ্চলের কাদা থেকে খনিজ নিষ্কাশন করে এরা এদের কসমেটিকস দ্রব্য প্রস্তুত করে। ফিলিস্তিনের মানুষকে উচ্ছেদ করে তাদের হকের জমি দখল করে ব্যবসা চালানো এই কোম্পানির বিরুদ্ধে বয়কটের ডাক আসে বি ডি এস মুভমেন্টের পক্ষ থেকে।

এইচ পি হলো একটি পৃথিবীখ্যাত কম্পিউটার ও ইলেক্টরনিক্স সামগ্রী প্রস্তুতকারক সংস্থা। ইজরায়েলি পুলিশ এবং তাদের গুপ্তচর সংস্থা মোসাদকে ব্যাপক ভাবে প্রযুক্তিগত সাহায্য করেছে এই এইচ পি। এমনটা শোনা যায় যে ইজরায়েলের বানানো নজরদারি সফটওয়্যার পেগাসস বানানোর পিছনে মোসাদের সবচেয়ে বড় সাগরেদ এই এইচ পি। তাই, খুবই স্বাভাবিক ভাবে বি ডি এস মুভমেন্ট এই

কোম্পানিকে বর্জন করার ডাক দেয়।

অ্যাক্সা একটি ফরাসি বীমা কোম্পানি সংস্থা। ইজরায়েলের তিনটি ব্যাংককে (হাপোআলিম, ব্যাংক লিউমি, মিজরাহি তেফাহত) নিয়মিত আর্থিক সাহায্য করে অ্যাক্সা। এই তিনটি ব্যাংকের অনেকটা অংশ শেয়ার আছে অ্যাক্সার কাছে। ফলত ইজরায়েলি সরকারকে একরকম ভাবে অর্থ যোগাচ্ছে অ্যাক্সা। তার পাশাপাশি এলবিট সিস্টেমসের বড় অংশ শেয়ার আছে অ্যাক্সার দখলে। এলবিট সিস্টেমস একটি অস্ত্র প্রস্তুতকারী সংস্থা। তাই, একথা বলার আর অপেক্ষা রাখে না যে এলবিট সিস্টেমসের হাতেও লেগে আছে অনেক নিরীহ ফিলিস্তিনি মানুষের রক্ত।

স্টারবাকসের একটা কফি প্রস্তুতকারক সংস্থা যাদের সারা পৃথিবী জুড়ে শাখা রয়েছে। স্টারবাকস ওয়ার্কার্স ইউনাইটেড, তাদের লেবার ইউনিয়ন ফিলিস্তিনের মানুষের সংহতিতে তাদের এক্স (আগে যা টুইটার নামে পরিচিত ছিল) একাউন্ট থেকে একটা পোস্ট করে। কোম্পানি এতে চোটে যায় কারণ তাদের মতে এতে নাকি কর্মচারীদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি হতে পারে। স্টারবাকস কতৃপক্ষ এই টুইটের বিপরীতে তাদের লেবার ইউনিয়নকে আইনি নোটিশ পাঠায়। শুধু তাই নয়, ব্যাপক হারে কর্মী ছাঁটাইয়ের হুমকি দেয় স্টারবাকস। শুরু হয় বয়কট স্টারবাকস মুভমেন্ট। এযাবৎকালের সবচেয়ে সফল মুভমেন্টের মধ্যে একটা এই বয়কট স্টারবাকস মুভমেন্ট। সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে ব্যাপক ভাবে মানুষ ফেটে পড়েন স্টারবাকস

বিরোধী প্রচার নিয়ে। একের পর এক কফি শপগুলি তালা পড়ে যাওয়ার ভিডিও উঠে আসতে থাকে।

স্টারবাকসের মত ম্যাকডোনাল্ডস নামের একটি ফাস্ট ফুড চেইন সারা পৃথিবী জুড়ে তাদের ব্যবসা চালায়। তারা এই যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে একটি নির্লজ্জ স্ট্যান্ড নেয়। ইজরায়েলি সৈনিকদের জন্য ফ্রি মিল দেওয়ার অফার চালু করে এই পরিস্থিতিতে। পরিণাম একই। বিশ্বজোড়া বয়কটের মুখে ম্যাকডোনাল্ডসের অনেক দোকান মুখ থুবড়ে পড়ে।

আমাদের দেশে এই ব্র্যান্ড বয়কট এসেছে দু রকম ভাবে। ২০০০ সাল নাগাদ কেরালার প্লাচিমাদাতে কিছু গ্রাম জলশুণ্য হয়ে যায়। অভিযোগের তীর গিয়ে পড়ে কাছেই অবস্থিত কোকা কোলা কারখানার দিকে। কোকাকোলা তাদের ঠান্ডা পানীয় প্রস্তুত করতে যে পরিমাণ মাটির তলার জল তোলে তাতে গোটা গ্রাম জলশুন্য হয়ে গেছে। চাষের কাজ এবং জনজীবন ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এই ঘটনা সারা দেশে একটা সাড়া ফেলে দেয় এবং আবারও কোকাকোলা বয়কটের একটা ক্ষীণ ডাক উঠতে দেখা যায়।

ব্র্যান্ড বয়কট যে সবসময় কিন্তু মানুষের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার পরের প্রতিক্রিয়া হিসেবে উঠে এসেছে এমন নয়। কিছু বছর আগেই ভারতবর্ষে ভারতীয় জনতা পার্টি বা বি জে পি সমর্থকদের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয় কারণ তনিশক নামক একটা গয়না প্রস্তুতকারী সংস্থা একটা বিজ্ঞাপন দেয় যেখানে একটা হিন্দু মুসলিম

বিবাহ দেখানো হচ্ছে। এতে এই উগ্র হিন্দুত্ববাদী মানুষদের ভাবাবেগে আঘাত লাগে এবং তারা তনিশক বয়কটের ডাক দেয়।

আমরা একবিংশ শতাব্দীতে এক পুঁজিবাদের রাজত্বে বাস করছি। সেখানে আমরা নিজের বাঁচার তাগিদে কিছু মানুষকে কিছু কর্পোরেটের বিরুদ্ধে গর্জে উঠতে দেখছি। মানবতার খাতিরে কয়েকদিন বাকি মানুষ যারা ভুক্তভুগী নয় তাদেরও এই বয়কটে সামিল হতে দেখছি। কিন্তু এই বাজার যদি পুঁজিবাদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাহলে আমরা সাধারণ ক্রেতারা শুধু এক কর্পোরেট সরিয়ে আর এক কর্পোরেট নিয়ে আসতে পারি। এর কোনো নিশ্চয়তা নেই যে কাল আমাদের নিয়ে আসা নতুন কর্পোরেট সংস্থা ওই একই কাজটা করবে না। তাই, ব্র্যান্ড বয়কট একটা সাময়িক রাস্তা হতে পারে, কিন্তু বৃহত্তর লক্ষ এই ব্যবস্থার বদল।

ডি-ডলারাইজেশন

দীপঙ্কর দে

রিসেট ১.০

২০২৩এর শেষে নতুন করে বিশ্ব ব্যবস্থা পালটানোর ক্ষমতাওয়ালা ফিলস্তিন-ইজরায়েল যুদ্ধের মাঝে কিছুটা নিরবে আরব-চিন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে, ভারত-রুশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে এবং আরও কিছু দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিশ্ব মুদ্রা হিসেবে আমেরিকার ডলারের প্রতিস্থাপন ঘটছে কোথাও চিনের ডিজিটাল ইউয়ান মুদ্রায়, কোথাও অন্য কোনও স্থানীয় মুদ্রায়। অর্থাৎ ১৯৭০এর দশকে আরব-ইজরায়েলের যুদ্ধের দৃশ্য প্রতিক্রিয়ায় যেভাবে ডলারের গুরুত্ব বিশ্ববাজারে তার চরম শিখরে পৌঁছেছিল, সেই প্রক্রিয়ার উল্টো বিশ্বপ্রক্রিয়া ডি-ডলারাইজেশন শুরু হয়েছে। এই ঘটনার শেকড় লুকিয়ে আছে গত তিন দশকজুড়ে ডলারকে মাত করার প্রক্রিয়ায় ডলার-ইওরো বিশ্ব লড়াই এবং তার ফাঁকে চিনের নেতৃত্বে গড়ে উঠতে থাকা নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থা তৈরিতে।

পলাশী চক্রান্ত কোনও সাধারণ ঘটনা ছিল না, ছিল বিশ্ব অর্থনীতির উৎপাদন ব্যবস্থা বদলের বাঁক - এশিয়া-আফ্রিকার নেতৃত্বে চাষী-হকার-কারিগর বিকেন্দ্রিভূত উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে কেন্দ্রিভূত অর্থনীতির দিকে যাত্রার অন্যতম সূচনাবিন্দু হিসেবে একেও গণ্য করা দরকার। মাথায় রাখতে হবে পশ্চিম ইওরোপের ইংলন্ড [এবং মেট্রোপলিটন হতে চাওয়া পশ্চিম ইওরোপিয় দেশগুলি] ১৭৫৭র আগেই কেন্দ্রিভূত অর্থনীতির দিকে যাত্রার ভূমিকা নির্মাণে ব্রতী হয়েছে। বিশ্বজুড়ে উপনিবেশ তৈরির আগে যে নিজেদের দেশে 'ছোটলোক'দের ওপর উপনিবেশ চাপিয়ে দিয়েছিল, তার প্রমান দিচ্ছেন Carl Wennerlind - Casualties of Credit_ The English Financial Revolution, 1620-1720, *তিনি বলছেন ১৬০০ থেকেই উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং সম্পত্তির অধিকারকে নতুন করে সাজিয়ে তোলার ফলে টিউডর আর স্টুয়ার্ট আমলে বিপুল সংখ্যক কৃষক জমিহীন, কাজহীন এবং উদ্বৃত্ত হয়ে গ্রামাঞ্চল থেকে উচ্ছেদ হল* *The fact that the newly improved agrarian techniques required less labor input meant that additional people were now added to the ranks of the propertyless and unemployed. Although the agricultural revolution would eventually make England a net-exporter of grain by the second half of the seventeenth century, the necessary restructuring of production methods and property relations substantially destabilized Tudor and early Stuart society।*

উৎপাদন ব্যবস্থা পাগান [অর্থাৎ ইংলন্ড এবং অন্য ইওরোপিয় দেশগুলো কারিগর, চাষী, হকার, পশুচারক, ধীবর] ব্যবস্থা থেকে কেন্দ্রিভূত অর্থনীতি তৈরির দিকে যাওয়ার পথে যে বিপুল সংখ্যক 'ছোটলোক' উচ্ছেদ হচ্ছে, ঠিক যেভাবে সাগরপাড়ে ১৭৭০এ বাংলার ওপর ছিয়াত্তরের মন্বন্তর(গণহত্যা) এবং ১৭৯৩তে জমি/সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' সম্পদ পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় উপনিবেশ রাষ্ট্র তৈরির কাণ্ডের ধাক্কায় পলাশীর পরের ফকির সন্ন্যাসী চাষী কারিগর হকার যেমন হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছিল, তেমনি ইংলন্ডের সর্বহারার রিটালিয়েট করতে থাকে। বিনয় ঘোষ নতুন উপনিবেশ আর প্রযুক্তির তাত্ত্বিক বেকনের

মানসিকতার মানুষ চাইছেন ইংলন্ডের দক্ষিণ এশিয় উপনিবেশ গড়ে তুলতে, সাম্রাজ্যবাদী তাত্ত্বিক ফ্রান্সিস বেকন খোদ ইংলন্ডে বসে উচ্ছেদ হওয়া ছোটলোকেদের 'অসামাজিক কাজকর্ম' নিয়ে খিস্তি করে বলছেন, 'এরা শালারা জ্বালিয়ে খাচ্ছে, চোখের বালি হয়ে উঠছে, সমাজে বিপদ আর গোলমালের বীজ রোপন করছে'।

এই উচ্ছেদ হওয়া ভবঘুরেদের কাজকর্ম 'ভদ্রবিত্ত' ব্রিটিশদের খিস্তি খাচ্ছে কারন ছোটলোক চুরি করে, পকেট মারে, ভদ্রবিত্ত 'শান্তিতে থাকতে চাওয়া' মানুষের সম্পত্তির অধিকারের ওপর হুমকি হয়ে উঠছে, মাতলামি করছে, বেলেল্লাপনা হিংসা চাপিয়ে দিচ্ছে। ভদ্রবিত্তরা এই উপদ্রব ছোটলোকেদের বেজম্মার বাচ্চা গালি দিচ্ছে।

সম্পত্তি এবং ভদ্রবিত্ত জনসাধারণের জীবন যাপনে শৃঙ্খলা বিপন্ন করার পাশাপাশি, এই উচ্ছেদ হওয়া ভবঘুরেরা ক্রমবর্ধমানভাবে অজনপ্রিয় হয়ে উঠছিল কেন না, ভদ্রবিত্তরা তাদের রোখার জন্যে বিপুল অর্থ খরচ করতে হচ্ছিল। এই লগে লগে এল পুওর ল'। ষোড়শ শত থেকে পুওর ল কার্যকর হবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত।

ইংলন্ড ছোটলোকেদের 'অবাধ্যতা' সামাল দিতে পারল বিংশ শতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে নতুন ওয়ার্ল্ড অর্ডার তৈরি করে। কার্ল লিখছেন The threatening consequences of the rural displacement were epitomized by the ever-presence of the dreaded vagrant figure, an annoyance at best and at worst, a danger to the entire social order. The natural philosopher and politician Sir Francis Bacon complained that these masterless tramps constituted "a burthen, an eye-sore and a scandal, and a seed of peril and tumult."18 Th is often itinerate class of paupers was disdained by polite society for many reasons. Most importantly, urban pickpockets and highwaymen constituted a threat to people's property. Public authorities were also concerned with the social disorderliness of the vagrants. Drunkenness, debauchery, petty violence, and bastardy were thought to be common traits of the dangerous poor.

In addition to jeopardizing property and public order, vagrants were increasingly unpopular because of the costs—mandated by the Poor Laws—they imposed on the parishes they visited. -

পশ্চিম ইওরোপের উপনিবেশ যুগের উত্তর সময়ে দীর্ঘস্থায়ী ইওরোপিয় কলোনি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ইওরোপির রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতিস্পর্ধী শক্তি হিসেবে বিশ্বব্যবস্থায় ডলারের রাজত্ব তৈরির উদ্যম নেয়। যদিও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে কেউ কেউ ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরামের ক্লাউস শোয়াবের অনুকরণে দ্বিতীয় রিসেট হিসেবে আখ্যা দিচ্ছেন, কিন্তু এটা কোনওভাবেই বিশ্বঅর্থনৈতিক ব্যবস্থায় রিসেট প্রক্রিয়া নয়। দ্বিতীয় রিসেটের প্রথম মুখড়া হল প্রথমে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে দিয়ে নোট বাতিল পরিকল্পনায় এনালগ অর্থনীতিকে ডিজিটাল ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করার ব্যর্থ লক্ষ্যে এবং তার চার বছর পর বিশ্বজোড়া কোভিদ নিয়মনীতি চাপিয়ে দেওয়ার উদ্যমে।

দীপঙ্কর দে এই প্রবন্ধে ব্যাখ্যা করেছেন কীভাবে দ্বিতীয় রিসেটের আগের চার দশকজুড়ে পৃথিবী পরিবর্তিত হয়েছে ডলারকে প্রতিস্থাপন করার প্রক্রিয়ায়।

মাথায় রাখা দরকার ইজরায়েল হল এশিয়ায় আমেরিকার সব থেকে বড়, স্থায়ী এবং বিনাশর্তে সামরিক, আর্থিক সাহায্য পাওয়া সেটলার কলোনি। ডলার যত শক্তিশালী হয়েছে ইজরায়েলের বিশ্বপ্রতাপ ততই বেড়েছে। আরব-ইজরায়েল যুদ্ধ উত্তর সময়ে অনেকেরই ধারণা হয়েছিল ইজরায়েল অর্থনৈতিকভাবে খুবই প্রতাপশালী অর্থনীতি। কিন্তু গত একমাসের বেশি সময় ধরে চলা ফিলিস্তিন-ইজরায়েল যুদ্ধে একটা বিষয় পরিষ্কার হয়েগিয়েছে, আমেরিকার আর্থিক সাহায্য ছাড়া তার অস্তিত্ব বিপন্ন। ঠিক সেই জন্যে আমেরিকা যুদ্ধ শুরু করার জন্যে তাকে বিপুল অর্থ ডোল হিসেবে দিতে বাধ্য হয়েছে।

প্রত্যেক কলোনি শুরু আর শেষ হয়েছে উপনিবেশে বিপুল গণহত্যা চাপিয়ে দিয়ে - সেই তথ্য বাঙালিদের থেকে আর কেউ বেশি জানে না - মাত্র দুটি গণহত্যায় ব্রিটিশ মেট্রোপলিটন হত্যা করেছে কম করে ১ কোটি ৩০ লক্ষ বাঙ্গালি।

সেটলার কলোনি ইজরায়েলও ফিলিস্তিনের ওপর ২০২৩এ একই রকম গণহত্যা চাপিয়ে দিচ্ছে। বিশ্বে প্রত্যেকটি সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছে দীর্ঘ প্রক্রিয়ায়, সেই ঘটনা গত ১০০ বছরে তৈরি হওয়া আমেরিকা সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রে ঘটতে যাচ্ছে।

আমেরিকার সাম্রাজ্য পতনের ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে ডি-ডলারাইজেশনে। বিশ্বজুড়ে ডিডলারাইজেশনের প্রক্রিয়া যত দ্রুত হবে, তত দ্রুত গতিতে স্বাধীনতাকামী ফিলিস্তিনিদের প্রতিরোধে লেখা হতে থাকবে এশিয়ায় অন্যতম সেটলার রাষ্ট্র ইজরায়েল-পতন-গাথা।

ফিলিস্তিনের জয় হোক।

সেটলার কলোনি ইজরায়েলের পতন হোক।

সম্পাদকমণ্ডলী

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর পশ্চিম ইওরোপের রাষ্ট্র নেতা ও বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারেরা সঙ্গত কারনেই ভেবেছিলেন পূর্ব ইওরোপের শস্তা শ্রমের (যে শ্রমিকদের গায়ের রঙ সাদা আর চোখের মণি নীল) উপর গড়ে তোলা যাবে এক নূতন শক্তিশালী ইওরোপ যে আবার বিশ্ব শাসন করার ক্ষমতা অর্জন করবে।

নব্বই দশকে ইওরোপিয় জোট-আর্থব্যবস্থায় তাদের হৃত গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠার তাগিদে ভূ-উষ্ণায়নজনিত আবহাওয়া সঙ্কটকে সুযোগে পরিণত করতে চাইল। তারা জানে মার্কিন ডলারের মূল ভিত্তি খনিজ তেলের আধিপত্য। সৌদি বদান্যতায় সেই সত্তরের দশক থেকে খনিজ তেলের যাবতীয় লেনদেন হচ্ছে মার্কিন ডলারে।তেলের দাম যত বাড়ে, ডলারের লেনদেন তত বাড়ে। ডলারের চাহিদাও বাড়ে, শক্তি বাড়ে। আর এই শক্তিমান ডলারের কল্যাণে মার্কিনিরা খনিজ তেল সহ পৃথিবীর যাবতীয় ভোগ্যবস্তুর আমদানি করে ইচ্ছে মত। মার্কিন আধিপত্য খর্ব করার একটাই রাস্তা - ডলারের শক্তি খর্ব করা। সেটা সম্ভব যদি খনিজ তেলের মজুদভাণ্ডার বেশিরভাগই উন্নয়নশীল দেশে ও তার অধিকাংশই মার্কিনিদের করায়ত্ব। তাই এমন একটা সংস্থা তৈরি করতে হবে যা খণিজ তেল শিল্পে নিয়োজিত বিশাল পুঁজিকে সরিয়ে আনবে, তেল অর্থনীতিকে দুর্বল করাবে, মার্কিন ডলারের মূল্য হ্রাস করাবে। এবং একই সাথে ডলারের বিকল্প হিসেবে এক সর্বগ্রাহ্য বিনিময় মুদ্রা প্রচলন করবে।

১৯৯২তে রিও-তে প্রথম বসুন্ধরা সম্মেলনের মূল উদ্যোক্তা ছিল ইওরোপ আর জাপান। উদ্দেশ্য বিশ্ববাজারে মার্কিন আধিপত্য খর্ব করা। সে লক্ষ্যে পশ্চিম ইওরোপের রাজনৈতিক নেতৃত্ব তিনটি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা করে -

১) এক শক্তিশালী ইওরোপ গঠনের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা;

২) বিশ্ববাজারে মার্কিন দাদাগিরি ঠেকাতে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা তৈরির উদ্যোগ;

৩) মার্কিন ডলারের একচেটিয়া ক্ষমতা হ্রাস করতে ইওরোপের নিজস্ব মুদ্রা ইওরো প্রচলন।

১৯৯২-এর প্রথম বসুন্ধরা সম্মেলন এই পরিকল্পনা রূপায়ণে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস। ব্যাখ্যা করা যাক।

মার্কিন ডলারের মূল ভিত্তি খনিজতেলের ক্রমবর্ধমান চাহিদা। কীভাবে? ১৯৭৩এ মধ্যপ্রাচ্যে জোর লড়াই বাধে। সে সুযোগে মার্কিনিরা সৌদি রাজপরিবারকে সামরিক সুরক্ষা দেওয়ার গ্যারেন্টির বিনিময়ে এক দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি করে। সেই চুক্তি মতে আজও বিশ্বজুড়ে OPEC তেলের যাবতীয় লেনদেন হয় মার্কিন ডলারে। খনিজ তেলের চাহিদা যত বাড়ে ডলারের মূল্য তত বাড়ে। এই শক্তিমান ডলারের মাধ্যমে মার্কিনিরা সারা পৃথিবীতে ছড়ি ঘোরায়। তাই মার্কিনিদের কাবু করার প্রাথমিক শর্ত ডলারের মূল্য কমানো। এবং সেটা সম্ভব হবে, যদি বিশ্বজুড়ে খনিজ তেলের চাহিদা কমানো গেলে। আরও কিছু কারনে জাপান ও পশ্চিম ইওরোপ চাইছিল জ্বালানি শিল্পে খনিজ তেলের পরিবর্তে অপ্রচলিত শক্তির ব্যবহার জনপ্রিয় করতে। কারনগুলো হল -

১) ইওরোপ আর জাপানে খনিজ তেলের ঘাটতি;

২) ১৯৮৬তে চেরনোবিল দুর্ঘটনার পর পারমানবিক শক্তির প্রতি মোহভঙ্গ। স্মরণ থাকতে পারে রিও সম্মেলন 'নিরবিচ্ছিন্ন উন্নয়ন'এর স্বপ্ন দেখালেও মূল নজর ছিল খনিজ তেলের ব্যবহারের সাথে ভূ-উষ্ণায়নের সম্পর্ক স্থাপনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগে।

প্রথম বসুন্ধরা সম্মেলনের আগের সময়ের কয়েকটা বিশ্বজোড়া গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী -

১৯৮৬ - চেরনোবিলে পারমানবিক দুর্ঘটনা;

১৯৯৬ - উরুগেয়ে চক্রের পথচলা শুরু, যা পরবর্তীকালে বিশ্ববাণিজ্য সঙ্গঠনে পরিণত হবে;

১৯৮৭ - নরওয়ের প্রধানমন্ত্রী নামাঙ্কিত ব্রন্দতলান্দ সমীক্ষা - 'আওয়ার কমন ফিচার' প্রকাশ;

১৯৮৭ - মন্ট্রিওল দলিলে স্বাক্ষর;

১৯৮৮ - আইপিসিসি-র প্রতিষ্ঠা;

১৯৮৯ - দুই জার্মানির মিলন;

১৯৮৯ - ডেলার্স প্রণীত 'রিপোর্ট অন ইকনমিক এন্ড মনিটারি ইউনিয়ন ইন দ্য ইওরোপিয়ান কমিউনিটি' প্রকাশ। অভিন্ন ইউরো মুদ্রা প্রবর্তনের ঘোষণা;

১৯৯১ - ফরাসি অর্থনীতিবিদ আর্থার ডাঙ্কেলের পরিকল্পনায় বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার খসড়া প্রস্তাব প্রকাশ।

আমরা জানি, ভূ-উষ্ণায়নের কারন নির্মাণে রাষ্ট্রপুঞ্জের আওতায় ১৯৮৮তে মার্কিন উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েহিল আইপিসিসি। বসুন্ধরা সম্মেলনে এর পাল্টা হিসেবে জন্মনিল ইউএনএফসিসিসি। নতুন সঙ্গঠনের স্থাপনা হয়েইছিল যেন ভূ-উষ্ণায়নের সংজ্ঞা বদল করতে।

১৯৯১তে ডাঙ্কেল সাহেব বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা প্রতিষ্ঠার খসড়া প্রস্তাব তৈরি করলেন। অন্যান্য কয়েকটা নতুন চুক্তির সঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মেধাচুক্তি বা TRIPS তাতে সামল হয়। উদ্যোক্তারা জানতেন, বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা তৈরির পর TRIPS সিবিডিকে ভোঁতা করে দেবে। সিবিডি বাণিজ্যিক স্বার্থে ঘা দিতে পারবে না কিন্তু জৈব বৈচিত্র রক্ষায় সাহায্য করবে। স্নানও হবে, আবার বেণীও ভিজবে না। বাস্তবে তাই হল।এইভাবেই ডলারের সশক্তিকরণের আড়ালে ১৯৯২তে তৈরি হল এক নতুন ডলার প্রতিস্পর্ধী আর্থব্যবস্থা, নতুন বিশ্বে দুই মেরুর লড়াইএর রণাঙ্গনের সূচনা ঘটল। ফিলিস্তিন-ইজরায়েল যুদ্ধ সেই আর্থব্যবস্থার পরিধি আরও বিস্তৃত হয়েছে। বিশ্ব অর্থনীতির নেতা হিসেবে উঠে এসেছে চিন।

রিসেট ২.০

গত শতকের শেষ দুই দশকে য়ুরোপ যখন নিজেদের হৃত গৌরব ফিরে পেতে মার্কিন ডলারকে কোনঠাসা করার ফন্দি আঁটছিলো তখন সবার অলোখ্যে বিশ্ব অর্থব্যবস্থায় নিজেদের গুরুত্ব বাড়াচ্ছিল চীন। অচিরেই পৃথিবীর শিল্প উৎপাদনের কেন্দ্র হয়ে উঠলো চীন। ইউরোপের নেতারা চীনের এই উত্থান সম্ভবত আঁচ করতে পারেননি। তারা তখন নতুন মুদ্রা 'ইউরো'র স্বপ্নে বিভোর।

চীনের উৎপাদন যত বাড়ছে তার রপ্তানিও বাড়ছে। আগে চীন যাবতীয় আমদানি রপ্তানি করতো মূলত মার্কিন ডলারে। হালে নিজস্ব মুদ্রা 'য়ুয়ান' আন্তর্জাতিক লেনদেনে ব্যবহার করছে চীন। এই সেপ্টেম্বর মাসে ইউরোকে হটিয়ে মার্কিন ডলারের পর আন্তর্জাতিক লেনদেনে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে চীনের ইউয়ান। পরিসংখ্যান বলছে ২০২৩এর সেপ্টেম্বরে আন্তর্জাতিক লেনদেনে শতাংশের নিরিখে উয়ানের অংশ ছিল ৫.৮%। একই সময়ে ইউরোয় লেনদেন হয়েছে মোট লেনদেনের ৫.৪৩%। তবে মার্কিন ডলার এখনো শীর্ষে। সেপ্টেম্বর মাসে আন্তর্জাতিক বাজারে ৮৪.১৫% লেনদেন হয়েছে মার্কিন ডলারে। চতুর্থ ও পঞ্চম স্থানে রয়েছে জাপানের ইয়েন ও সৌদি আরবের রিয়াল।

পাঁচ বছর আগে আন্তর্জাতিক বাজারে ইউয়ানে লেনদেন হয়েছিল মোট লেনদেনের মাত্র ১.৮১%। গত ক'বছরে চীনের ইউয়ানের চাহিদা বেড়েছে খুব দ্রুত হারে। এখন ইউরোকে টেক্কা দিয়ে মার্কিন ডলারের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠছে ইউয়ান। অবশ্য বিশ্ববাজারে মার্কিন ডলারের চাহিদা খানিকটা কমলেও তার আধিপত্য আরো কিছুকাল বজায় থাকবে বলেই অনুমান করা যায়।

শ্রীলঙ্কায় তামিল ইলমের আন্দোলনের পাশে ফিলিস্তিনের জনগণ বড়োভাবে দাঁড়িয়েছিলেন। এই পোস্টার ১৯৮৫র আশেপাশের সময়ের।

লায়লা খালিদ জিন্দাবাদ!

উপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে অমর লড়াই জিন্দাবাদ!

প্রতিবাদে প্রতিরোধে - ঢাকা

ব্যাঙ্কসি ব্রিগেড

প্যালেস্টাইনের
স্বাধীনতা
সংগ্রামের পাশে
দাঁড়ান"
হকার সংগ্রাম কমিটি
বন্দীমুক্তি কমিটি

১৭৭০/১১৭৬ গণহত্যা গবেষণা আন্দোলন ।। জনভাণ্ডার ।। অপ্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা উদ্যম।। বই প্রকাশ পরিকল্পনা।। গ্রন্থাগার প্রকল্প

জনদানে প্রকল্প পরিচালনা

১। ১৭৭০ এবং...
মিল্টন বিশ্বাস এবং দেবোত্তম চক্রবর্তী সম্পাদিত
প্রকাশিতব্য নভেম্বর বা ডিসেম্বর

আপাতত লেখা দিয়েছেন - ক। অনুপম পাল পলাশী পূর্বের কৃষি ব্যবস্থা এবং পলাশীর পরের উপনিবেশিক চাষ কাঠামোর বিস্তার ।। খ। নারায়ণ মাহাত পলাশীর পর জঙ্গমহলের স্বাধীনতা সংগ্রাম [চিকিৎসা ব্যবস্থার জ্ঞানচর্চা বিষয়ে আরও একটি লেখা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন] ।। গ। প্রণব ভট্টাচার্য বাঙ্গলার ইতিহাসের এক বিস্মৃতপ্রায় অধ্যায় ছিয়াত্তরের মন্বন্তর এবং কারিগরদের দুর্দশা ।। ঘ। নয়ন তানবিরুল বারি যে কারণে ফুলপুর কবরস্থানে দাফন করেনা কেউ ।। ঙ। বিকাশ এস. জয়নাবাদ রাঢ় বাংলা - বর্গি আক্রমণ থেকে ছিয়াত্তরের গণহত্যা [বিকাশ এস. জয়নাবাদ দাদা স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে একটি লেখা দেওয়ার ।। প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন] ।। চ। বিশ্বেন্দু নন্দ পলাশীর প্রভাবে মেয়েরা অন্তরীণ হলেন, রোজগার আর সম্পত্তির অধিকার হারালেন - একটি সাধারণ ধারণা ।। ছ। ১০০০ বছর বাংলায় ছোটলোক-ভদ্রলোক দ্বন্দ্ব ইতিহাস ।।
ব্যয় আনুমানিক ৭০,০০০ টাকা

২। টেগোর ল্যান্ড ঠাকুর কলোনি প্রকল্প
গবেষণা নেতৃত্ব অত্রি ভট্টাচার্য এবং শাহজাহান আলি

রবিবাবুর শিক্ষা চিন্তায় উপনিবেশিক ভদ্রবিত্তীয় প্রদূষণ এবং তিনি যে জ্ঞান আর শ্রমের মিলিত শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার চেষ্টা করেছিলেন নিজের ছেলে আর লক্ষ্মীশ্বর সিংহকে বিদেশে পাঠিয়ে, শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করে, সেই প্রক্রিয়াকে সাবোতাজ করার ইতিহাস আমরা খুঁজছি। নব্য শান্তিনিকেতনি ভাবনাচিন্তার বিরোধিতার কেন্দ্রে আছেন স্যর যদুনাথ সরকার - তিনি ব্রিটিশ আঙ্গিক অনুসরণে শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ব্যবস্থার গোটা ভাবনাকে উড়িয়ে দিচ্ছেন। মূলত কয়েকটি বিখ্যাত শান্তিনিকেতনি আশ্রমিক পরিবার রবীন্দ্রনাথকে ঠাকুর বানিয়ে যদুনাথ সরকারের ভাবনাকে সামনে রেখে ভদ্রবিত্ত উপনিবেশিক শিক্ষা কাঠামো শান্তিনিকেতনে চাপিয়ে দিয়েছে এবং শিক্ষা ব্যবস্থাকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নামিয়ে আনার উদ্যম নিইয়েছে যাতে তাদের সন্তানেরা চাকরি করার সুযোগ পায়। এক বিখ্যাত পত্রিকা সম্পাদক রবীন্দ্রনাথকে সামনে রেখে কেজি টু পিজি প্রকল্প চালু করেছেন এবং এটা ১৯৪১এর পরে উদ্দাম গতিতে চলেছে, দেশজ মানুষকে উচ্ছেদ করে, তাদের ওপর পরজীবি ভদ্রবিত্তের উপনিবেশ চাপিয়ে দিয়েছে, ঘেটোয় থাকতে বাধ্য করেছে, মিউজিয়ামের মত খোয়াইয়ে হাটে তাদের শোকেস করাচ্ছে। আমাদের কাজ এই সব অভিচারের মূলে পৌঁছনোর।
সময় লাগবে ৮ থেকে ১০ মাস।
আনুমানিক ব্যয় ১ লক্ষ ৫০ টাকা

৩। হকার ব্যবস্থা নিয়ে প্রকল্প
গবেষণা নেতৃত্ব বহ্নিহোত্রী হাজরা, অত্রি ভট্টাচার্য

রেল হকার, পথ হকার নিয়ে অনেকগুলো সমীক্ষা। একটা সমীক্ষা অপ্রচলিত পত্রিকায় প্রকাশিত। শক্তিমান ঘোষের সাক্ষাৎকার নেওয়া চলছে। অন্তত ৩টে বইএর পরিকল্পনা।
সময় ১ বছর
আনুমানিক ব্যয় ২ লক্ষ টাকা

৪। ক্যাডার কয়েদি
গবেষণা নেতৃত্ব অত্রি ভট্টাচার্য

স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ক্রমিকভাবে কেবলমাত্র রাজনৈতিক কর্মীদের ইতিহাসকে কেন্দ্র করে কোনো সংকলন তৈরী হয়নি। তাই এই সম্পাদিত সংকলনের পরিকল্পনা - যাতে একইসঙ্গে, অনুবাদ, পুনর্মুদ্রণ, এবং সাক্ষাৎকার থাকবে। সংকলনটির মূল উদ্দেশ্য কমিউনিস্ট চিরকালীন অসুখ/সমস্যা/আমলাতন্ত্র, ভদ্রলোকামি, তথাকথিত 'নিচুতলার' কথা না শুনে, নিজেদের কেন্দ্রীয় কমিটির/ পলিটব্যুরোর বক্তব্য চাপিয়ে দেওয়া [গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা], এবং সেই সিদ্ধান্তগুলির পরিণতি হিসাবে বাম-অবাম-আন্দোলনের অবক্ষয়কে চিহ্নিত করা। সর্বোপরি সিপিআইএম, সিপিআই ও নকশালগোষ্ঠী, ট্রটস্কিপন্থী, গান্ধীবাদী, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ'র কিছু জীবিত পুরাতন কর্মীর বয়ান নথিভুক্ত করা- যাতে ক্রনোলজিক্যালি নেতৃবৃন্দের দৃষ্টিতে নয়, কর্মীদের চোখে বাংলায় বামআন্দোলনের ইতিহাসকে- বৈশ্বিক ও জাতীয় পরিপ্রেক্ষিতে আজ পুনরায় বিবেচনা করা এই সংকলনটির মূল উদ্দেশ্য হবে।

৫। বাংলার সূচি আর বয়ন শিল্পের ইতিহাস
গবেষণা প্রধান কারিগর মহুয়া লাহিড়ী

বাংলার সূচি আর বয়ন শিল্পের ইতিহাস লেখার কাজ নিয়ে এগোচ্ছেন। লেখা এগোচ্ছে। নতুন কিছু সূত্র পেয়েছেন। সেই সূত্রগুলো নিয়ে আরও কাজ করা দরকার। উনি কলকাতা থাকা কালীন একবার দুবার বৈঠক হবে।

৬। বৃহত্তর বাংলার হাট ব্যবস্থা সমীক্ষা
গবেষণা নেতৃত্ব দেবেন বহ্নিহোত্রী হাজরা

কারিগর ব্যবস্থার অবস্থা আর কর্পোরেট আগ্রাসন বুঝতে পশ্চিমবঙ্গ আর বাংলাদেশ হাট ব্যবস্থা সমীক্ষা। পশ্চিমবঙ্গের চারটে ভৌগোলিক অঞ্চল রাঢ় বাংলা, গাঙ্গেয় উপত্যকা, মধ্য বঙ্গ এবং তরাই অঞ্চলের মোট ১০ হাট। বাংলাদেশেরও মোট ১০টা হাট।
সময় অন্তত ১ বছর, হয়ত আরও একটু বেশি
প্রকল্প ব্যয় ১,০০,০০০

৭। মন্দির গবেষকদের কাজের নথিকরণ আর হুগলীর টেরাকোটা মসজিদ মাজার সমীক্ষা
এই মুহূর্তে মন্দির/মাজার গবেষক আছেন, তাদের কাজগুলোকেই নথিকরণ করা হবে।
ইন্দ্রনীল মজুমদারের নেতৃত্ব

৯। গ্রন্থাগার প্রকল্প
৪ হিদারাম ব্যানার্জী লেনে গ্রন্থাগার চালু হয়েছে। মঙ্গল, বৃহস্পতি শনি খোলা

দান দেওয়ার জন্যে
জ্ঞানগঞ্জ অছি সবে নথিবদ্ধ হয়েছে, ব্যাঙ্কএকাউন্ট হয় নি। আপাতত আমরা বন্ধু কারিগর সংগঠন কলাবতী মুদ্রার অছিতে দান নিচ্ছি।

Kalaboti Mudra,
bank of india, J N Road Branch,
A/C - 402620110000228, IFSC - bkid 0004026